সূচীপত্র।

সে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। তাহার কারণ কি জান? সে বলে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে, ভগ্নী। যদি জিজ্ঞাসা কর, উহাকে বিবাহ করিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এ সমস্ত মতাদি ছিল না। বালিকার দশায় কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব, তাহার পর ব্রাহ্মবিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব। ও তখন ভালবাসিয়া আর যাহাকে ইচ্ছা স্বামীত্বে বরণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া অনাথশরণের একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল—তাহার নাম হেমন্তকুমার সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই অনাথের মনে ধারণা জন্মিল যে সে হেমন্তকুমারের দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী নগেন্দ্রবালাকে ভালবাসে। মনের এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালবাসা একটি ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষতঃ হেমন্তকুমারের প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়। অনাথ মন্দাকিনীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগ্নী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী, ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইল। এই বিবাহ হইলেই

ষোড়শী।

বউ-চুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলার একটি সুনিবিড় পল্লীগ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোষ্ট আফিস হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে দেবী মহামায়ার একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতে ইহার নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটির একটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন তাঁহার নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মধ্যম পুত্র অনাথশরণ, বি, এ পরীক্ষা দিয়া কয়েকদিন হইল বাটী আসিয়াছে। ছেলেটির বয়স বাইশ বৎসর হইবে, বেশে পারিপাট্য আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপরে কয়েকটি কারণে অত্যন্ত চটা। প্রথমতঃ সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু

যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথাকথিত স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত—প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহাই ভালবাসার চরম সফলতা,—বিবাহ নাই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্য্যন্ত, তাহার অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগত প্রায়। জ্যৈষ্ঠমাসের আম-পাকান রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অনাথশরণ বহির্ব্বাটীর কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এই খানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো, প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া থাকে। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারি, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া আর কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের একখানি সদ্যঃপ্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠি রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কি যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরা কাগজ লইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল:—

"আজ রাত্রি বারটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিয়া, কাগজখানিকে পাকাইয়া পাকাইয়া ছোট করিল। পূর্ব্বকথিত খামসুদ্ধ চিঠিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতে-ছেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া, চুরি করিয়া কুলআচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীয়টি পূজার ঘর; নারায়ণ-শিলা আছেন। মূর্ত্তিবিদ্বেষবশতঃ ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটী পাতিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল; বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁইবীচি ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বূলরাগরঞ্জিত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; অঞ্চলাগ্র গলায় জড়ান। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল, স্বামীকে দেখিতে পায় নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভাল করিয়া দেখিতেছে!

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল;—দেখিল বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে

বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আনিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতরে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল; আবার আমগাছের পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র হইয়া, নারায়ণ শিলার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল।

আজ তাহার জীবনের কি দিন? বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। জরগাঁয়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল; ফুলশয্যা হইতে যে তিনদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেরো বৎসরের। মাঝে একবার আসিয়া কয়েক মাস ছিল, তখন, অনাথের নূতন "মতাদি" হইয়াছে। পরিজনবর্গের বহু আকিঞ্চন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করে নাই! এবার রাগ করিয়া তাহাকে কেহ

বাটীর ভিতর আনিবার চেষ্টা করে নাই। অনাথের মাতা প্রতিদিনই নবীনাগণকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এতদিনে স্বামীর কি মনে পড়িয়াছে? মন্দার এ জীবনটা কি তবে বিফল হইবে না? স্বামী থাকিতেও তবে কি তাহাকে বিধবার জীবন যাপন করিতে হইবে না? তাহার আত্মীয়াগণের, সখীদের, স্বামীর ভালবাসার কথা, সোহাগের কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে করিয়াছে যাহার জন্য ঈশ্বর তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন! এইবার কি সে সব দুঃখ তবে দূর হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীর চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। অর্গলিত দুয়ারে বাহির হইতে কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার ছোট ননদ হরিমতি। হরিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। হরিমতি মন্দার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়; তবু দুইজনে খুব ভাব। দুই জনে দুই জনের সকল সুখদুঃখের ভাগী।

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল—"তোর কি হয়েছে লা?" মন্দা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"হবে আবার কি?"

"দোর বন্ধ করে কি কর্‌ছিলি?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতির ভারি সন্দেহ হইল। মন্দার গলাটি জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বল্‌বিনে ভাই?"

"বল্‌ব।"

"কখন বলবি ?"

"রাত্তিরে।"

"না, এখনি বল্ !"

মন্দাও বলিবে না, হরিমতিও ছাড়িবে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া হরিমতি প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"হাসছিস কেন ভাই ?"

হরিমতি বলিল—"হাসছি তোর বরটির রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। এবার এসে অবধি ছোড়দার উস্ খুস্ করে বেড়ান হচ্চে। বলেও ছিলাম বড় বউদিদিকে।"

"কি বলেছিলি ?"

"বলেছিলাম, ওগো, এবার হয়ত ছোড়দার মন হয়েছে। এবার তোমরা চেষ্টা কর দেখি, এবার হয়ত ঘরে আসবেন। তা বউদিদি বল্লেন—মন হয়েছে ত আসুক না। আমি কি বারণ করেছি নাকি ? আমি বল্লাম—এতদিন আসেন নি, এখন আপনা হতে কি আসতে পারেন ? লজ্জা করে হয়ত। তিনি বল্লেন—সে বার অমন করে আমাদের অপমান করলে, আবার আমি সাধ্‌তে যাব ! আমি তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দু মাস ত এ... ছুটী আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিব—"আমি কিন্তু ভাই যেতে পারব না।"

"কেন ?"

"সে আমায় ভারি লজ্জা করবে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল—"ওলো দেখিস ! কচি খুকীটি

কিনা ; বরের কাছে যেতে লজ্জা করবে ! কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুণছিস্, তাই বল্। মুখে আর ন্যাকামো করতে হবে না।"

মন্দা বলিল—"না ভাই, ঠাট্টা রাখ্। আমার ভারি ভয় হচ্চে।"

"প্রথম দিনটে ভয় হতে পারে। তা, একদিন বই ত নয়।"

"রোজ রোজ আমি যাব বুঝি ? তা হলে একদিন ধরা পড়তে হবে না ?"

"ধরা না পড়লে আর উপায় কি ভাই ? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গতেই হবে।"

"তার চেয়ে তুই বরং বউদিদিকে বল্গে আর একবার। তিনি যা হয় করবেন।"

"আচ্ছা তা বলব ; কিন্তু আজকের দিনটে চুরি করেই তোদের দেখা হোক। দেখিস চুরির কাঁচা পেয়ারাটা আমটার মতন চুরির সব জিনিষই বড় মিষ্টি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ছোট বউ, ও ছোট বউ, ঘুমুলি ভাই ?"

রাত্রে শয্যায় হরিমতি মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বারোটা হয়েছে ?"

"বারোটা ছেড়ে এই একটা বাজল ছোড়দার ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?"

"না:—আমার চোখে কি আর ঘুম আছে? যত ঘুম তোর। বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।"

এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আলনা হইতে খানা ধোয়া দেশী শাড়ী পাড়িয়া বলিল—"নে এইখানা পর্।"

দাকিনী... —আর অততে কাজ নেই।" হরিমতি উঠিয়া বসিল। দেখি... ময়লা কাপড় পরে কি যায়?" বলিয়া ার আঁচল ধরিয়া টান দিল। তখন মন্দা হরিমতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হরিমতি বলিল—"বল্, এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে না কি?" মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ এ সময় হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইবে না। সুতরাং বলিল— "নইলে আমি বউ মানুষ একা যাব নাকি?"

দুই জনে দুয়ার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। নিস্তব্ধ জ্যাৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পায়ে মল ছিল, ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল—"আ মরণ! মল গুলো পা থেকে খুলিস্‌নি? ভাবে ভোর হয়েছিস্ যে!"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিল। তার পর দুই জনে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। কাছাকাছি পর্য্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কাণে কাণে বলিয়া দিল— "দোর ভেজিয়ে রাখব; আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চারিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরের বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে।

প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগি ল। বুকটি দুড় দুড় করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ... করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছে।

পিছু ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয় একদিন ধরা পড়তে বাতিটা নিবাইয়া দিল। ঘরে ... এখন তাহা যেন হাসিয়া উঠি ... র বিছানায় স্বামীর মুখে, জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। মন্দা ... অনেকক্ষণ সেই সুপ্ত মুখখানি দেখিল; ভাবিল—ইনি ... আমার স্বামী বড় সুন্দর।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল—"বেশ মানুষ ত! লোককে ডেকে এনে নিজে ... করে নিদ্রা হচ্ছে।"

কি করিবে কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষ স্থির করিল, কখনও ত পদসেবা করিতে পাই নাই; এই প্রথম সুযোগ ছাড়িব কে

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া, ... হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে অনাথশরণের নিদ্রা গভীরতর হইল। জানালা দিয়া মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিয়ৎকাল—প্রায় আধ ঘণ্টা—কাটিলে, মন্দা স্বামীর পার কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবা মাত্র অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত অনুভব করিল, তাহার মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ক্রমে স্মরণ হইল, আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিয়াছে; যতক্ষণ জাগিয়া ছিল, তাহারই

প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন সাড়ে বারোটা হইয়া গেল তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিয়া শয়ন করিয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। অমনি তাহার পা মন্দাকিনীর গায়ে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিয়াছে; এই ... ার মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনা... নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল।

...নে হইল। ঠোঁট দুখানি এক একবার ...ছে; মন্দা বুঝি তখন কোনও স্বপ্ন দেখিতেছিল!

স্ত্রীর ...নে চাহিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড় সুন্দর! এ যেন নগেন্দ্রবালার চেয়েও সুন্দর। দুই তিন মিনিট এই-ভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল; চক্ষু বুজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ে বল দাও।

চন্দ্রালোক হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে ভাবিয়া অনাথ ...তি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিল। কেরোসিনের তীব্র আলোকে ... হইল বুঝি স্বপ্নজড়িমা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর পায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কাপড় চোপড়-গুলা কিছুতেই যেন আর বাগ মানে না। অনেক চেষ্টার পর, রীতিমত ঘোমটা দিয়া, অনাথের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া, মুখ নত করিয়া বসিল।

অনাথ ডাকিল—"মন্দাকিনী।"

মন্দা নিমেষমাত্র কাল ঘোমটার ভিতর হইতে অনাথের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনী, আজ তোমায় কেন ডেকেছি জান ?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল সে জানে না।

অনাথ বলিল—"তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমায় কল্‌কাতায় যেতে হবে। যাবে ?"

মন্দা উত্তর করিল না। অনাথ বলিল—"যাবে কি ?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল—"আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব।"

"আমার বাপ মার অমতে অজ্ঞান্‌তে। ... পারবে ?"

মন্দা কোনও উত্তর করে না। অনাথ বলিল—"কথা কও এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে পারবে ? বল।"

মন্দা বলিল—"মা বাপের অজ্ঞান্‌তে কেন ? তাঁদের অনুমতি নাওনা, এখন ত সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্চে।"

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম বাবার মত নেই। বলেছেন—ওর এখন মতি গতির স্থিরতা কি ? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক্। বাড়ী বউটোকে যে জুতো মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, আমি বেঁচে থাক্‌তে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কি ?"

"আমরা দু জনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গণিল। স্বামী কি রহস্য করিতেছেন বলিল—"আমি ঠাকুর দেবতা মানি, আমি কি করে ব্রহ্মজ্ঞানী হব ?"

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—"ও সকল বিশ্বা

তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ও সব ভুল। আমি কি করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ?”

“তুমি লেখা পড়া শিখেছ। আমার কি বুদ্ধি আছে ?”

“তোমাকেও লেখাপড়া শেখাব। কল্‌কাতায় গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেব। মেয়েদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেব ?”

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—“লেখাপড়া যদি শিখতে হয় তবে আমি তোমার কাছে শিখব। বুড়ো বয়সে আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।”

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—“তুমি ভুল আমরা দুজনে একত্র এক বাড়ীতে থাকব না ত।”

মন্দাকিনী বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—“তবে আমি কোথায় থাকব ?”

“সেই ইস্কুলেই ; সেইখানে মেয়েরা পড়ে, থাকে, রীতিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।”

মন্দা স্থিরস্বরে বলিল—“তবে আমি যাব না।”

অনাথ দেখিল, যেখানে রোগ, সেখানে চিকিৎসা হইতেছে । সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। বলিল—“কেন আমি দুদিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি তুমি কিছু শুনেছ ?”

মন্দা বলিল—“শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।”

“তবে বুঝিয়ে বলি, শোন। প্রথমতঃ আমাদের বিবাহ ভালবাসার ফল নয়। দ্বিতীয়তঃ তার অনুষ্ঠানাদি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দুটি কারণে, আমার মতে আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। স্কুলে ?”

"না।"

"তবে আর একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলি শোন! আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

মন্দা বলিল—"তা ত দেখ্‌তেই পাচ্চি।"

"আমি আর একজনকে ভালবাসি।"

"তবে আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে কি করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভাল না বেসে বিয়ে করেছি তাই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। তার উপর বাকী জীবনটা নিষ্ফল করে দিয়ে আর সর্ব্বনাশ করব না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে ইচ্ছে বিবাহ কোরো। এই জন্যে কল্‌কাতায় গেলে আমাদের একত্রবাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে?"

মন্দাকিনী বেশী করিয়া ঘোমটা দিল। কোনও করিল না, প্রশ্ন করিল না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পারিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই রাত্রে, নির্জ্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল—"মন্দা, কাঁদ কেন? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যেই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল—"মন্দা!"—এবার স্বর অন্যরূপ; এ যেন দরের স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশী কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ? এত ক্লেশ? একটা ভাবী পরিত্রাণের আনন্দ সে অনুভব করিল না? আমি ভালবাসিনা—ভালবাসিতে পারি না,—তাহা জানে; এ বন্ধন ছিন্ন হইলে, জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? তবে কি আমায় ভালবাসে?"

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল—"আমি যাই।"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল। তাহার হাতখানি ধরিল,—ধরিয়া বলিল—"তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিত স্বরে উত্তর করিল—"আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কাল এস। আসবে?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা, কাল নিশ্চয় এস।" অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল। মন্দা বলিল—"আচ্ছা।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন যখন অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। প্রথমেই মন্দাকিনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি ছবির মত তাহার মনে উদয় হইল।

অনাথ উঠিয়া বসিল। দেখিল চুলে পরিবার একটি সোণার কাঁটা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেটি তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রাতে সে প্রতিদিন সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া থাকে। কখনও বাদ যায় না। আজ আর তাহা হইয়া উঠিল না। আজ তাহার মনটা বড় উদ্‌ভ্রান্ত।

গ্রামের বাহিরে নদীতীরে গিয়া অনাথ পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎ পরে দেখিতে পাইল, বাটীর এক জন ভৃত্য মাখন সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে।

হঠাৎ অমঙ্গল শঙ্কায় তাহার মন চমকিয়া উঠিল। কি হইয়াছে? ও কি আমাকে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত?

মাখন সর্দ্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল সে কাঁদিতেছে। দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি মাখন? কি হয়েছে?"

মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আর দাদা ঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাকতে যাচ্ছি। কাটি ঘা।"

কাটি ঘা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূরে। কাহার এরূপ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

তখনি অনাথ বাড়ী ফিরিল। প্রথমে সহজ পদবিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল; পরে দৌড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় বাড়ীতে আসিতে একটু ঘুরিতে হয়। বাগানের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিল। বাগানে ’পানে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিয়দ্দূরে গাছের আড়ালে হরিমতি ও মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইল। তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছে। দেখিয়া অনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। উভয়েরই মাথার কাপড় খোলা। মন্দাকিনীর মুখখানি বিষণ্ণতা মাখা, হরিমতির চক্ষু দুইটি কৌতুকপূর্ণ। প্রথমে হরিমতিরা অনাথকে দেখিতে পায় নাই, কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল। মন্দাকিনী ত্রস্ত হইয়া ঘোমটা দিল। হরিমতি অনাথের প্রতি যেন গোপনে হাস্য করিতেছে, যেন তাহার চক্ষু দুইটি দাদাকে বলিতেছে—"আমি সব জানি গো জানি।" অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "হরি, কাকে সাপে কামড়েছে?" হরিমতি বিস্মিত হইয়া বলিল—"সাপে কামড়েছে? কই, কাকে তা ত জানিনে।"

অনাথ বৈঠকখানায় গিয়া শুনিল, মাখন সর্দ্দারের স্ত্রীকে সর্পদংশন করিয়াছে। তখন সে মাখনের বাড়ীর অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, অনেক লোক জমিয়াছে, রোজাগণ উচ্চ স্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বাঁচিল না। মাখন যখন রোজা লইয়া আসিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখিয়া মাখনের যে কান্না! পাঁচ বৎসরের বালকের মত ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া সে কাঁদিতে

লাগিল। অনেকে সেই শোকাবহ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, হায় হায় করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। অনাথও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিল; অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এক জন কৃষকের অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ে এত ভালবাসা! ইচ্ছা করিল হেমন্তকুমারকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখায়। সে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, মন্ত্রপড়া বিবাহে ভালবাসা কিছুতেই জন্মিতে পারে না, তাহা একেবারেই অসম্ভব।

বাড়ী পৌছিয়া দেখিল হেমন্তকুমারের একখানি পত্র আসিয়াছে।

সত্যমেব জয়তে।

কলিকাতা।
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

প্রিয় ভ্রাতঃ

গত কল্য তোমাকে যে পত্র খানি লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। অন্য একটা সুসংবাদ আছে। কান্তপুরের রাজা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীরঞ্জন বাহাদুর তাঁহার পুত্রের জন্য একটি শিক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলেন, বৈকালে দুই ঘণ্টা পড়াইতে হইবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। তোমায় তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন। কিন্তু তাহা হইলে তোমায় এক সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব্ব পরামর্শমত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে

সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া আইস। তোমার উত্তর পাইলেই আমি মহিলা বিদ্যালয়ে তাঁহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

আমার সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগ্নী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছু মাত্র দ্বিধা বা শঙ্কা করিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মরণ করিও পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য্য সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; ঈশা স্বীয় প্রিয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা তোমার সহায় হউন।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ।

অনাথ হেমন্তকুমারের পত্রের কোনও উত্তর দিল না। মন্দাকিনীর অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়! সে যে ভারি দুঃখিত! কি করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দ্দারের ব্যাপার দেখিয়া তাহার মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। হয় ত মন্দাকিনী তাহাকে ভালবাসে, তাই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুর! বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চার না হইলে, পরে যে তাহা হইবেই না, তাহার স্থিরতা সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যা বেলায় তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহার হাতে একটি খাম দিয়া সবেগে পলায়ন করিল। খাম আটা দিয়া বন্ধ, ভিতরে চিঠি রহিয়াছে, অথচ কোন শিরোনামা নাই। অনাথ খাম খানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল; তাহাতে লেখা আছে :—

প্রিয়তমেষু—

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

চরণাশ্রিতা দাসী

শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী।

এ পত্র পাইয়া অনাথ ভাবি বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত? বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে আর দুঃখ নাই?

কয় পংক্তি অনাথ বারম্বার পাঠ করিল। যদি দুঃখ নাই তবে ভাল বাসে না। অথচ লিখিয়াছে "প্রিয়তমেষু"— "চরণাশ্রিতা দাসী"—ইহার অর্থ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, ওগুলা বাঁধিগৎ, ওগুলার কোনও বিশেষ অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে তোমাকে ভালবাসে না বাসে তাহাতে তোমার কি? মন বলিল—নাঃ—তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালার মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত

মন্দা বলিল—"ভাল আছি। তুমি ভাত খেয়েছ?" ব৷৷৷৷ত লিতে আশে পাশে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে দোকান নহে, এ গৃহ; পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"একি! আমি এ কোথায় রয়েছি?"

অনাথ বলিল—"মন্দা, তোমাকে যে আর কথা কইতে শুনব, তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে। এ এখানকার জমিদারের বাড়ী!"

মন্দা বলিল—"তিন দিন!"

"হ্যাঁ মন্দা, তিন দিন তুমি অচেতন হয়ে ছিলে। এখন যদি বাঁচাতে পারি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিল—"তোমায় একটা কথা বলব।"

অনাথ বলিল—"কি মন্দা?"

"আমাকে বাঁচিও না।"

এ কথা শুনিয়া অনাথের চক্ষু দিয়া জল আসিতে লাগিল। বলিল—"ছি মন্দা, ও কথা কি বলতে আছে? তুমি ভাল হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল। জলভরা চোখ দুইটি অনাথের পানে ফিরাইয়া বলিল—"কি হবে আমার বেঁচে? আমায় যেতে দাও।"

অনাথ বলিল—"না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেব না।"

"কি করবে আমায় নিয়ে?"

"আমি তোমায় ভালবাসব।"

হাত পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! সঙ্গে না আছে বিছানা বালিস না আছে বাহুল্য বস্ত্র। মন্দা কিসেই বা শয়ন করে, কি বা গায়ে দেয়! অনাথ বলিল—"একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি কম্বল চেয়ে এনে বিছানা করে দিচ্চি।"

মন্দাকিনী বলিল—"তুমি আগে খেতে বস। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তারপর শোব এখন।"

অনাথ বলিল—"পাগল! এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমার এমন অসুখ, আমি কি খেতে পারি?"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমার অসুখ তা কি? তা বলে' তুমি উপবাসী থাকবে? দুদিনের কষ্টে তোমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীর নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আর খান দুই তিন কম্বল লইয়া আসিল। সেই গুলি দিয়া বিছানা করিয়া মন্দাকে বলিল—"শোবে এস। মন্দা বলিল—"ওকি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না, মন্দাকিনীকে শয়ন করাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী দুই তিন বার বলিল—"ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে কষ্ট হবে।" কিন্তু আর বেশীক্ষণ জিদ করিবার শক্তি তাহার রহিল না; অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

*   *   *   *

তিন দিন পরে যখন মন্দাকিনীর জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বিছানার কাছে স্বামী বসিয়া।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"মন্দা, কেমন আছ?

রোগিণীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তার ভার আর সহিতে পারিলে না। চক্ষু মুদিয়া মন্দা যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিলেন! অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—"দুপুর বেলাকার ওষুধটার বেশ ফল হয়েছে। জ্ঞান হয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে কথা-বার্ত্তা কয়েছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তবে আর ভাবনা নেই। এ জ্বরটুকু দুদিনে সারিয়ে দেব। কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন। এ তিন দিন ত এক রকম না খেয়ে আপনি ঠায় বসে আছেন। আপনার মত পত্নী-প্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি।"

অনাথ মনে মনে বলিল—"খুব কম বটে।" প্রকাশ্যে বলিল—"আমার স্ত্রী, আমি ত স্বভাবতঃই করব। কিন্তু আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।"

প্রবীণ ডাক্তার বাবু, আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিতচিত্ত হইয়া বলিলেন,—আমি বেশী কি করেছি? আমি যা করেছি সেই ত আমার পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের বলে এ বাগানবাড়ী খুলিয়ে না দিতেন; তাহলে দোকানের সে সাঁৎসেঁতে মেঝের কম্বলের ওপর শুয়ে আমার স্ত্রী কদিন বাঁচতেন?"

ডাক্তার বাবু কথা উল্টাইয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। তাহার পর ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিনে রাত্রে দশটায় মন্দার জ্বর মগ্ন হইল। সে সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ করিল। তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনাথও কয়দিনের পর খুব ঘুমাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে যখন ডাক্তার বাবু আসিলেন, তখন মন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিল। জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিয়া ডাক্তার বাবু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আর কিছু মাত্র ভয় নাই। এখন ইহাঁকে খুব প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, অনাথ মন্দাকে নিয়মিত ঔষধ পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহার পর দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল—"এ কদিন কি খেলে?"

"ডাক্তার বাবুদের বাড়ী থেকে খাবার আসত।"

"তবে চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? একবারে শুকিয়ে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই তোমার যত কষ্টের মূল। আমার জন্যে কেন এত করলে?"

অনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—"যদি আমার ব্যারাম হয়, তা হলে তুমি আমার জন্যে কর না?"

মন্দা বিছানার দিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে বলিল—"আর ব্যারামের প্রার্থনায় কায নেই।"

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—"প্রার্থনা নাই করলাম, হলে কর কি না?"

"করি না ত কি?"

"কেন?"

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল—"তুমি যে আমার স্বামী।"

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিয়া বলিল—"তুমি যে আমার স্ত্রী।"

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কবে থেকে ?"

"যে দিন তোমায় ভালবেসেছি।"

মন্দাকিনী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল—"তুমি না ব্রাহ্ম ? তুমি না মিছে কথা বল না ?"

অনাথ বলিব—"আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"তবে সে দিন বল্লে 'ভালবাসব' ?"

অনাথ নিরুত্তর। বলিল—"তুমি ত আমায় ভালবাস না।"

"কিসে জানলে ?"

"তুমি ত আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে দিতে সম্মত হয়েছিলে। তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।"

মন্দা হাসিয়া বলিল—"তা বুঝি ?"

"কি তবে ?"

"আমি বুঝি আসতে চেয়েছিলাম ? ঠাকুরঝিই ত আমাকে পাঠালে।"

"তার ভারি ইচ্ছে তোমার আর একটি বিয়ে হয় ?"

"হ্যাঁ,—পাত্রও ঠিক করে দিয়েছিল।"

"কে ?"

"যমরাজা।"

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল—"ঠাকুরঝি বলেছিল তোকে যেমন দাদা বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তুই তেমনি পথে তার মন ডাকাতি করবি। না যদি পারিস, তবে—"

অনাথ বাধা দিয়া বলিল—"তবে ঐ বিয়ের বন্দোবস্ত ? তা ডাকাতিই করেছ বটে। এদিকে অন্য বিয়ের গাগাড়যন্ত্রটিও বেশ করে তুলেছিলে।"

মন্দা বলিল—"কিন্তু সে ভালবাসার বিয়ে হচ্ছিল না। তাই ব্যাঘাত হল। ঠিক কখন আমি ডাকাতিটে করেছি, শুন্‌তে পাইনে ?"

"সে সব পরে বলব।"

"কখন করেছি, সেইটে বল।"

"কখন ? যে দিন প্রথম আমার বিছানায় পার তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আরম্ভ করেছ আর কি। তার পর সারাপথে।"

চাণক্যপণ্ডিত বুধগণের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন, ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্র স্থাপন করিবে না, করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই নরনারী স্বামী স্ত্রী এবং তরুণ বয়স্ক হইলে কি আর রক্ষা আছে !

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল—"পথে তবে কেন আত্ম-সমর্পণ করনি ?"

অনাথ কিছু না বলিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল—"নগেন্দ্রবালা ? আমার স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে, নগেন্দ্রবালার বড় সাধ্যি ! চল একবার কল-কাতায়, তাকে আমি দেখব।"

অনাথ বলিল—"কল্‌কাতায় ত যাব না। পশ্চিম যাব, তোমার শরীর সারাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কাণে তুলিল না। জিজ্ঞাসা করিল—

কিয়দ্দিন তোমায় ভালবাসে? তা হলে তার ত ভারি দুঃখ ও উপাস

সে আমায় ভালবাসে কি না, সেই জানে আর ঈশ্বরই জানেন!"

"বলেনি? জিজ্ঞাসা করনি?"

"তার সঙ্গে কখন একথা হয়নি।"

"তুমি ভালবাসতে তা সে জানে?"

"কি করে জানবে?"

মন্দা অভিমান ভরে বলিল—"সে না জানুক, তুমি ত বাসতে!"

অনাথ বলিল—"কৈ আর বাসতাম? তা হলে তুমি এত শীঘ্র এত সম্পূর্ণভাবে আমাকে জয় করলে কি করে? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল আমি যথার্থ ভাল বাসতাম না। শুধু চোখের ভালবাসা ছিল, অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য্য, এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল।"

দুইদিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। দুইটি দিন দুই জনে বাগান বাড়ীতে বড়ই আনন্দে যাপন করিল।

আজ সন্ধ্যায় ডাক্তার বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া, কল্য প্রভাতের গাড়ীতে তাহারা মুঙ্গের যাত্রা করিবে। সমস্ত ঠিক ঠাক।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া অনাথ হেমন্ত কুমারের নিকট হইতে এই পত্র পাইল—

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং

কলিকা? তা

২৫ জ্যৈষ্ঠ। ম ও বেশ

প্রিয় ভ্রাতঃ

ভগ্নী মন্দাকিনীর অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর শীঘ্র তাঁহার আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটা দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালবাসেন। আমারও বিশ্বাস তাহাই ছিল। কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম, শরতের সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিবাহ স্থির। আরও শুনিলাম, দুইবৎসর হইতে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতরাং নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে তুমি যে অনুমান করিয়াছিলে তোমার প্রতি তিনি প্রণয়বতী, তাহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র।

এখন তুমি কি করিবে? এ দুঃসহ শোক কেমন করিয়া বহন করিবে?

তোমার আর একটা ভুল হইয়াছে। হিন্দু মতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইনের সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং তোমরা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও, সে বন্ধন ছিন্ন করিবার পথও বন্ধ।

তুমি কি কলকাতায় আসিবে? চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগ্নী আরোগ্য লাভ করেন, এখানে আসিতে পার, তাহা হইলেও পূর্ব্বকথিত রাজবাড়ীর সেই কার্য্যটি হস্তান্তরিত হইবে না। কিন্তু আমার পরামর্শ, ভগ্নীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি

কিয়দ্দিন হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে গমন করতঃ তপস্যা ও উপাসনার দ্বারায় চিত্তস্থির ও আত্মশান্তিবিধান করিবে।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ।

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল,—"তবে আর নগেন্দ্রবালার ওপর আমার রাগ নেই। মুঙ্গেরে না গিয়ে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালার বিয়েটা দেখতে হবে।"

অনাথ বলিল—"তাই চল। মুঙ্গেরে যাবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমায় ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসর দেওয়া।"

শুনিয়া মন্দাকিনী ভারি অভিমানের ভান করিল। বলিল—"তাই তখন মনের কথা খুলে বল্লেই ত হত! বলা হল তোমার শরীর সারাবার জন্যে পশ্চিম যাচ্চি।"

বাহিরে অন্ধকার বকুলগাছে একটা কোকিল বসিয়াছিল, সে হয়ত মানবের ভাষা বুঝিতে পারে। বুঝি মন্দাকিনীর এ ছলনাময় মানকথা শুনিয়া সে ভারি আমোদ পাইল, তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"না গো, না;—তা নয়।"

সারদার কীর্ত্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ষ্টীমারে খুলনা যাইতেছিলাম—সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন; ক্যাবিন্ রিজার্ভ করা ছিল। সারা দ্বিপ্রহর দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম। সন্ধ্যার কিয়ৎপূর্ব্বে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি ভাবিলাম, এ অবকাশে ছাদে গিয়া একটু সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া আসি।

সেইমাত্র ষ্টীমার মাণিকদহঘাট ছাড়িয়াছে। ক্যাবিনের ভিতর বসিয়া মনে হইয়াছিল, আর বেলা নাই; বাহির হইয়া দেখিলাম সূর্য্যাস্ত হইতে তখনও বিলম্ব রহিয়াছে। সুতরাং ছাদে যাওয়া হ[illegible] অলসভাবে ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছি, হঠাৎ একটি অপরিচিত যুবা আমার কাছে আসিয়া আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

দূরের দৃশ্য দেখিবার জন্য চশমা বদলাইয়া ক্যাবিন্ হইতে বাহির হইয়াছিলাম। চশমা খুলিয়া যুবকটির মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। পূর্ব্বে তাহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

লোকটির বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। একহারা চেহারা,

চক্ষু বসা, মাথায় বড় বড় চুল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য অবস্থার পরিচায়ক।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে?"

"আজ্ঞা আমার নাম শ্রীসারদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। নিবাস কুমারখালি।'

"আমাকে চিন্‌লেন কি করে?"

যুবক একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিল—"মশায়কে বাঙ্গালা দেশে কে আর না চেনে! আপনার তুল্য স্বদেশহিতৈষী বাগ্মী——"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—"কি চান আপনি?"

"আমি যা চাই, তা ক্রমে নিবেদন কর্‌ছি। সে অনেক কথা। যদি দয়া করে শোনেন, তবে কৃতার্থ হই।"—বলিয়া লোকটা ডেকের তক্তাগ্র পানে সন্নদ্ধদৃষ্টি হইল।

ব্যাপারটা কি আমি কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না; ভাবিলাম, হয়ত কিছু অর্থসাহায্য চাহে। অন্য দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম—"তা বলুন, শুনছি।"

"মশায়, একটু নির্জ্জন স্থান আবশ্যক। একটু ওদিকটেতে যাবেন কি?"

"চলুন"—বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। সে আমার পাশে দাঁড়াইয়া আমার মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া মনে করিলাম, পূর্ব্বে হয়ত এ অবস্থাপন্ন

ছিল, এখন এরূপ দশা হইয়াছে। যাক্কার ভাষা মুখে আসিয়া বাধিয়া যাইতেছে।

"আপনাকে আমি প্রণাম কর্‌লাম কেন বুঝ্‌তে পেরেছেন?"

"না, কেন বলুন দেখি?"

"আপনি আমার পিতা।"

শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম—"কি রকম?"

লোকটা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"আপনি আমার পিতা কি না ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু আপনার স্ত্রী আমার মাতা।" বলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিল।

বুঝিলাম, লোকটা পাগল। পূর্ব্বের অশ্রদ্ধার ভাবটা মন হইতে তিরোহিত হইয়া, একটু দয়া হইল।

"আপনি অবিশ্বাস কর্‌ছেন? আপনি ভাবছেন লোকটা পাগল? তিনি আমার মা বটেন, তবে এ জন্মের মা নন। আসল কথাটা তবে বলে ফেলি। আমি পাঁচ বচ্ছর ধরে কাসরোগে কষ্ট পাচ্চি। কত রকম চিকিৎসা করালাম, কিছুই হল না। মেট্রোপলিটনে বি, এ, পড়ছিলাম, পড়া বন্ধ করতে হল। দেখুন না চেহারা খানা, একেবারে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে পড়েছি। বেশী দিন আর বাঁচতে হবে না। দিন সাতেক হল, গ্রামের বাইরে বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়ে সারা সন্ধেটা উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। মা মা বলে কত কাঁদলাম। কত প্রার্থনা করলাম। সন্ধের পর বাড়ী ফিরে এলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যেন মা বিশালাক্ষী আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন—আপনার

নাম করে—তাঁর যিনি স্ত্রী,—তিনি আর জন্মে তোর মা ছিলেন। তুই তাঁকে মদ খেয়ে একদিন বাপান্ত করে গাল দিয়েছিলি, সেই পাপে তোর এই কঠিন রোগ হয়েছে। তাঁর কাছে যা, তাঁর পাদোদক পান করগে যা, ভাল হবে। বলেই মা বিশালাক্ষী অন্তর্ধান কর্‌লেন।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে চুপ করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—“আপনি কোথায় যাচ্চেন ?”

হাত দুটি যোড় করিয়া সে বলিল—“সব শুনেছেন, আর এ অধমকে ‘আপনি’ বলে কেন সম্ভাষণ করেন ? ‘তুমি’ বলুন বা ‘তুই’ বলুন।” —বলিয়া হেঁট হইয়া আমার জুতা দুইটা ছুঁইয়া স্বীয় ললাটস্পর্শ করিল।

“তুমি এখন কোথা যাচ্চ ?”

“আমি যাচ্চি দৌলতপুর। সেখানে আমার মামার বাড়ী। সেখান থেকে কল্‌কাতায় যেতাম, আপনার সন্ধানে।”

“আমি কল্‌কাতায় যাচ্চি, এ সংবাদ আপনাকে কে দিলে ?”

আকুলস্বরে সে বলিল—“আবার ‘আপনাকে’ ?”

“তোমায় কে বল্লে ?”

“কেউ বলেনি। আমি কি জানিনে যে কল্‌কাতায় এবার কন্‌গ্রেসের অধিবেশন ? আমি কি জানিনে যে ব্যারিষ্টারশ্রেষ্ঠ মিষ্টার অতুল বানার্জ্জি না হলে স্বদেশহিতকর কোন কার্য্যই হবার যো নেই ! দেশের মধ্যে কে এমন—”

“তা ভালই হয়েছে। আপনার—তোমার অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল।”

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সারদা জিজ্ঞাসা। করিল—“আমার মা কি আপনার সঙ্গেই আছেন ?”

“আছেন। আজই চাও পাদোদক ?”

“আজ পেলে কি আর কালকের জন্মে অপেক্ষা কর্‌তে পারি ?”

“তবে দাঁড়াও এখেনে।” বলিয়া আমি ক্যাবিন্ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

ক্যাবিন্ পরিত্যাগের পর বোধ হয় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়াছিল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম,আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই মুখে হাতের আড়াল করিয়া একটি হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?”

আমি তাঁহার শয্যাসন্নিধি বসিয়া তাঁর চুলের ভিতর আঙুল বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—“একটি বড় মজা হয়েছে।

“কি গা ?”

“তোমার ছেলে এসেছে।” বলিয়াই অনুশোচনায় মরিয়া গেলাম ! আমাদের একটি দুই বৎসরের সন্তান ছিল, সে এই ঘটনার দেড় বৎসর পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। আমি একটা অসাবধানতায় আমার স্ত্রীর মনে কি শোকস্মৃতি জ্বালিয়া দিলাম !

তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—“কি বলছ ?”

আমি তাঁহাকে কাছে টানিয়া বলিলাম—“ষ্টীমারে একজন সন্ন্যাসীর দর্শন পেয়েছি। তিনি আমার হাত দেখে বলেছেন শীগ্‌গির আমার ছেলে হবে।”

উপস্থিতবুদ্ধিতে এইটুকুর বেশী যোগাইল না। কিন্তু কোনও

ফল হইল না। তাঁহার দুইটি চোখের কোণে জল দেখা দিল। আমি তাঁহাকে বক্ষে বাঁধিলাম। মুখচুম্বন করিলাম। রুমাল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিলাম, নিজের চোখও মুছিলাম। কি কথা বলিয়া চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরাই, ভাবিতে লাগিলাম।

গবাক্ষপথে দেখিলাম, সূর্য্যাস্তকাল সমুপস্থিত। বলিলাম—"চল, ছাদে চল, সূর্য্যাস্ত দেখিগে। পদ্মাবক্ষে সূর্য্যাস্ত কখনো ত দেখনি।"

তিনি উঠিলেন। পাশের কামরায় গিয়া মুখ চক্ষু ধৌত করিয়া, কেশবেশ বাহিরে যাইবার মত করিয়া আসিলেন।

দুই জনে ছাদে গিয়া পদচারণা করিতে লাগিলাম। সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হইল। ষ্টীমার হু হু করিয়া জল কাটিয়া ছুটিতেছে। ক্রমে নাগরকান্দি ষ্টেসন ঘাট নিকটবর্ত্তী হইল। আমরা ছাদ হইতে নামিয়া গেলাম।

সিঁড়ির পাশে সারদাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া। আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ইনি আমার মা ?" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আমার স্ত্রীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমার স্ত্রী থতমত খাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম—"একটা কথা আছে, ক্যাবিনে গিয়ে বল্‌ব।" সারদার প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। কোথা হইতে ভাল আপদ জুটিয়াছে! বলিলাম—"অপেক্ষা করুন না। আপনি অত ব্যস্ত হচ্চেন কেন ?"

সারদা সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। বলিয়া গেল—"আমি ঐ এঞ্জিনের কাছে থাকব।"

স্ত্রীকে লইয়া ক্যাবিনে গিয়া সকল কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আমি পাদোক জল দিতে পার্‌বনা।"

আমি বলিলাম—"তাতে আর হানি কি?"

"তুমি ঐ গাঁজাখুরী কথা বিশ্বাস কর নাকি?"

"করিনে। কিন্তু ওর মনে যদি ঐ বিশ্বাস হয়, তবে হয়ত উপকার পাবে। এমন অনেক হয়েছে শুন্‌তে পাই।"

"কি হয়েছে? জন্মান্তরের মা বাপকে স্বপ্ন দেখে, ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়ে তাদের পাদোকজল খেতে যায়?"

"না;—একটা কিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস কর্‌লে, রোগ অনেক সময় আরাম হয়।"

এ কথা শুনিয়া আমার্ স্ত্রী চুপ করিয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"তা শুধু জলই একটু দাওগে না। বিশ্বাস হলেই হল যে পাদোকজল।"

"তার দরকার কি? সে যে ছলনা করা হবে।" বলিয়া চায়ের একটা পেয়ালাতে একটু জল ঢালিলাম।

আমার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে মোজা খুলিলেন। বলিলেন—"ভাল জ্বালা! তোমাকে যেমন বোকা ভালমানুষটি পেয়েছে! বিলেতে যে কোনও মেম ভুলিয়ে তোমায় বিয়ে করে ফেলেনি, সেই আমি আশ্চর্য্য হই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তা হলে তোমার কপালের এ কষ্টটা কোথায় যায় বল! এতদিন তুমি ত তা হলে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী!"

ঠাট্টা করার লোভটি আমার স্ত্রী সম্বরণ করিতে পারেন না, কিন্তু উল্টিয়া একটু ঠাট্টা কর দেখি, তাহা আর সহ্য হয় না।

বলিলেন—"যাও যাও, তোমার আর চালাকি কর্‌তে হবে না। ভারি রসিকতা হল কি না!"

আমি বাক্যব্যয় না করিয়া পেয়ালাটি লইয়া তাঁহার কোমল পদপল্লব ধারণ করিলাম। তন্মুহূর্ত্তে তিনি পা কাড়িয়া লইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন—"পা ছোঁয়া কেন?" আমার উত্তরের অবসর না দিয়া, আমার হাত হইতে পেয়ালা লইয়া, জলে পাদাঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। পার্শ্বস্থ টেবিলে সেটি রাখিয়া বলিলেন—"বেয়ারাকে বল দিয়ে আসুক।"

আমি উঠিয়া বলিলাম,—"বেয়ারা কি তাকে চেনে! আমিই দিয়ে আসি।" বলিয়া পেয়ালাটি তুলিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন—"ও কি কর? কথা বল্লে শোন না কেন?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম—"দেখ, মেয়েদের লেখা পড়া শেখানো একেবারে ভস্মে ঘি ঢালা। এত লেখা পড়া শিখলে তবু এই সামান্য প্রেজুডিসটে গেল না!"

বলিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কন্‌গ্রেস শেষ হইয়াছে, ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছি, একদিন সন্ধ্যার সময় দরোয়ান শ্লেট হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা দেখা করিতে আসিলে কার্ড আনে না, তাহাদের জন্য একখানা শ্লেট রাখিয়া দিয়াছিলাম। শ্লেটে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে, "সারদাপ্রসন্ন চাটার্জ্জি।"

দুই মাসের পুরাতন কথা, সহসা স্মরণ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, বুঝি কোনও নূতন মক্কেল অসিয়াছে।

ডাকিয়া পাঠাইলাম। চেহারা দেখিবামাত্র সারদাকে অবশ্য চিনিতে পারিলাম। আসিয়াই সে আমাকে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

"কি হে? কেমন আছ বল দিকিন? কিছু উপকার টুপকার পেলে?"

সারদা প্রথমতঃ কথার কোনও উত্তর না দিয়া, বুকে হাত দিয়া বারকতক কাসিল। শেষকালে বলিল—"বেশ দিন কতক সেরে গিয়েছিল"—(খক্ খক্)—"আবার—(খক্ খক্)—দিন পাঁচ সাত" (খক্ খক্ খক্)—আর বলিতে পারিল না, কাসিতে কাসিতে নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তাহার কাসির ধমক থামিলে বলিলাম—"পাদোকজলের কর্ম্ম নয়। ওষুধ খাও।"

"পাই কোথা?" বলিয়া আবার কাসিতে আরম্ভ করিল।

সাড়ে সাতটা বাজে। বাড়ীতে একটা ডিনার পার্টি ছিল। এখনি লোকজন আসিতে আরম্ভ হইবে। এ সময় এ আসিয়া জুটিল কেন? তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিবার অভিপ্রায়ে পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিলাম। সারদাকে দিয়া বলিলাম—"এই নাও, কোনও ভাল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে একটা ওষুধ পত্র খাওগে, পাদকজলে কি রোগ ভাল হয়?"

এই সময় মিষ্টার বোসের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমি সারদাকে তাড়াতাড়ি বলিলাম—"আজ আমি ভারি ব্যস্ত আছি—যাও।"

সারদা টাকা কয়টি পকেটে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেক বেলা হইয়াছে। উঠিয়া সাসির কাছে দাঁড়াইয়া নিম্নে বাগানের পানে দৃষ্টিপাত করিলাম। কালো সার্জ্জের চাদর গায়ে দিয়া কে একজন পায়-চারি করিতেছে। আমার পানে যতক্ষণ পিছন ফিরিয়া ছিল, ততক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারি নাই, সম্মুখ ফিরিলেই দেখিলাম সারদা। পিত্ত জ্বলিয়া গেল। প্রভাত হইতে না হইতেই আসিয়া জুটিয়াছে! এখনি দরোয়ান শ্লেট লইয়া আসে দেখিতেছি!

চায়ের টেবিলে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের সহিত তাহার কার্ড উপস্থিত। আমার স্ত্রী তখনও নামেন নাই। সে আসিয়া প্রথমেই আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার পর বলিল —"কাল সারা রাত আমার নিদ্রা হয়নি। আমার প্রতি আপনার এই অহেতুক স্নেহ দেখে আমি অবাক হয়ে আছি। আমি কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই, আমার চিকিৎসার জন্যে পাঁচ পাঁচটা টাকা! এ টাকা কটি ফিরিয়ে নিন।" বলিয়া টাকা কয়টি টেবিলে রাখিয়া দিল।

সারদার এই প্রকার আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। বলিলাম "না না, ওটাকা আর ফিরে দিতে হবে না; তোমার চিকিৎসাব্যয়ের জন্য দিয়েছি।"

সারদা বারকতক কাসিয়া বলিল—"দেখুন, দৈবশক্তিতেই আমার বেশী বিশ্বাস। ডাক্তারি কবিরাজিতে আমার বিশ্বাস ফিশ্বাস নেই। এ অবস্থায় ওতে অর্থ ব্যয় কি মিছে হবে না?"

আমি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলাম—"একেবারে বিশ্বাস না থাকলে ফল হওয়া শক্ত বটে।"

সে বলিল—"আমার আন্তরিক বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মা ঠাকরুণের (উদ্দেশে করপুটে প্রণাম করিল) পাদোকজল দুবেলা খেতে পাই, আর তাঁকে দুবেলা প্রণাম করতে পাই, তা হলে আমি একেবারে আরাম হয়ে যাই। নইলে এ যাত্রা আমার নিস্কৃতি নেই।" বলিয়া তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলাম। দুইবেলা পাদোদক দিতে এবং প্রণাম লইতে আমার স্ত্রী রাজি হইবেন কি? এই সময় লোকটা অত্যন্ত কাসিতে লাগিল। তাহার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার মনে ভারি দয়া হইল। ভাবিলাম—আহা রাজি হওয়া উচিত। আমার স্ত্রীকে রাজি করিব। কত রকমে লোকে লোকের উপকার করে। এই সামান্য উপায়ে যদি ইহার উপকার হয়, যদি ইহার প্রাণটা বাঁচে, তাহা হইলে করা উচিত।

সারদাকে বলিলাম—"তুমি নীচে গিয়ে কর্ম্মচারীদের ঘরে অপেক্ষা কর। আমি তোমায় ডেকে পাঠাব।"

স্ত্রীর সন্ধানে গেলাম। শুনিলাম তিনি স্নানের ঘরে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহার দর্শন পাইলাম।

বারান্দায় একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া তিনি চুল শুকাইতে বসিলেন। আমি বলিলাম—"সারদা আবার এসেছে"।

"সেই ষ্টীমারের সারদা? আবার কেন এসেছে?"

বাঃ—আমার স্ত্রীর কি স্মরণশক্তি! আমি কিন্তু শ্লেটে সারদার নাম দেখিয়া প্রথমতঃ উহাকে চিনি নাই।

"তার কাসি আবার বেড়েছে।"

"আর আমি পাদোকজল দিতে পারব না কিন্তু। একবার দিয়ে বিশ্বাসবিরুদ্ধ কায করেছি। আমি পীর না পয়গম্বর যে আমার পাদোকজল খেয়ে ওর ব্যারাম ভাল হবে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তোমার মত সকলে ত উচ্চ-শিক্ষিত নব্য আলোকপ্রাপ্ত নয়;—ওর যদি তাই বিশ্বাস হয়! সেবার ত ভাল হয়ে গিয়েছিল বল্লে।"

আমি দেখিলাম, এবার একটু বেগ পাইতে হইবে। স্পষ্টতঃ ইনি মনে করিয়াছেন, সেবারকার মত এক পেয়ালা পাদোদক দিলেই চুকিয়া যাইবে। যদি শুনেন, তা নয়, এখন কিছুদিন ধরিয়া ক্রমাগত দুইবেলা উক্ত মহার্ঘ্য দ্রব্যটি বিতরণ করিতে হইবে, তাহা হইলে একেবারে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িবেন।

তথাপি বলিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যতটা বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়াছিলাম,—ততটা হইল না। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"ডাক্তারি কবিরাজি কোনও ওষুধে ওর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই? দুবেলা আমার পাদোকজল খাবে? তাতেই ও ভাল হবে?"

"ও ত তাই বল্ছে। বলছে নইলে এ যাত্রা ও বাঁচবে না। আহা ওর প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

আমার স্ত্রী মৌন থাকিয়া সম্মতিলক্ষণ প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

সারদাকে এ শুভসংবাদ জ্ঞাত করাতে সে আনন্দে অধীর হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাসা কোথায়?"

"আমার এখানে কেউ নেই।"

"কোথা থাকবে?"

"এখানে আমাকে একটু স্থান দিতে পারেন না দয়া করে? যদি এত দয়া করলেন"—বলিয়া চুপ করিল।

আমি বলিলাম—"আমার কর্ম্মচারিদের একটা মেসের মত আছে। সেই খানেই থাকতে পার।"

সারদা বলিল—"সে ত বেশ হবে। কাল রাত্রে আমি সেই-খানেই খেয়েছিলাম কি না"—বলিয়া সারদা কাসিতে আরম্ভ করিল।

কাসি থামিলে বলিল—"আজ একবার যদি অনুমতি করেন, তবে মার শ্রীচরণ দর্শন করি।"

স্ত্রীর কাছে তাঁহাকে লইয়া গেলাম। সে তাঁহাকে প্রণাম করিল। আমার স্ত্রী তাহার মুখপানে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

টেবিলে গ্লাসে জল ছিল। সারদা তাহাই একটু হাতে লইয়া মাটীতে বসিয়া, পাদোদক খাইল। পান করিয়া অবশিষ্ট অংশ মাথায় মুছিয়া ফেলিল।

এইরূপ দুই তিন দিন করিল। কিন্তু তাহার রোগের কিছু-মাত্র উপশম দেখা গেল না। আমাকে সারদা বলিল—"মা কি ভাল মনে আমায় পাদোদক দিচ্ছেন না? এবার সারছে না কেন?"—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সেদিন এই কথা আমার স্ত্রীকে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"ওষুধ খাবে না বিষুধ খাবে না, পাদোকজল খেয়ে মানুষের রোগ ভাল হয়? যত সব অনাসৃষ্টি আবদার!"

আমি বলিলাম—"দেখ, ইচ্ছাশক্তিতে বোধ হয় কিছু কায

হয়। তুমি পাদোদকজল দেবার সময় মনে মনে খুব আগ্রহের সঙ্গে ভেবো, এই জলে এর রোগ ভাল হবে।"

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন—"দিনকের দিন যেন সং হচ্চ। বিলিতি ময়ূরপুচ্ছ ক্রমশঃই তোমার গা থেকে খসে খসে পড়ছে।"

আমি কপট অভিমান সহকারে বলিলাম—"অর্থাৎ আমাকে প্রকারান্তরে দাঁড়কাক বলা হল। এতই যদি কালো দেখেছিলে, তবে বিয়ে করলে কেন? ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব—"

আমার স্ত্রী এবার আর চটিলেন না। বলিলেন—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ সবাই তোমার মত কালো হলে ত জগৎ আলো হয়ে যেত।"

কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। আমি যে একজন সুপুরুষ, তাহা বিলাতের মহিলাসমাজ পর্য্যন্ত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিদিন সারদার শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। তাহার কাসি প্রায় সারিয়া উঠিল, মুখের ফ্যাকাসে রঙ, কালো হইতে লাগিল। চোখের কোলে মাংস জমিতে লাগিল। দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। আমার স্ত্রীও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি প্রায়ই সারদাকে ডাকাইয়া ফায়ফরমাস করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিদিগকে বিশ্বাস করিয়া যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে না পাঠাইতে পারিতেন, তাহা সারদাকে ভার দিতেন।

২৭শে বৈশাখ একটি বিবাহোপলক্ষ্যে বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে অনেক রাত্রি অবধি থাকিবার কথা ছিল। বিবাহান্তে থিয়েটারের অভিনয় হইবে। বাড়ী ফিরিতে অন্ততঃ রাত্রি দুইটা বাজিবে, ইহা আমাদের চাকর বাকর কর্ম্মচারিদিগকে বলিয়াছিলাম। সারদাকে কিছুদিন হইতে আমার আইন পুস্তকের লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তাহাকে বলিলাম—"আজ তুমি লাইব্রেরীতে শয়ন কর। একটু সজাগ থেকো।"

সে বলিল—"আমাকে বল্‌তে হবে না, আমি জেগেই থাকব এখন, যতক্ষণ আপনারা না ফেরেন।"

জাগিয়াই সে ছিল বটে, পরে প্রমাণ পাইলাম।

ফিরিতে রাত্রি ৩টা বাজিল। আমার স্ত্রী বেশপরিবর্ত্তন করিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি একা শয়ন-কক্ষের দ্বারমুক্ত করিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু-স্থির হইয়া গেল।

বড় সিন্দুকের সম্মুখে সারদা বসিয়া আছে।' আশে পাশে খানকতক রূপার বাসন ছড়ান। বাসনের আলমারী খোলা। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সারদা "বাবা—বাবা" বলিয়া অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তাহার কাছে গিয়া দেখিলাম, সে বন্দী। এই সিন্দুকে যে কলটা লাগান ছিল, তাহার একটু ইতিহাস আছে। বিলাতে অবস্থান কালীন আমি নীলামে অনেক মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিয়াছিলাম। একটা ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়, কলটা সেই ব্যাঙ্কের। কলে একটা তালা আছে কিন্তু তাহার চাবি নাই। ঘূর্ণ্যমান

কয়েকটা অঙ্গুরীয়াকার ধাতুখণ্ডের যথাসন্নিবেশে একটা নির্দ্দিষ্ট ইংরাজি নাম সাজাইতে হয়, তাহার পর টানিলেই খুলিয়া যায়। কিন্তু খুলিবার পূর্ব্বে, তৎসংলগ্ন একটা পিন স্থানভ্রষ্ট করার আবশ্যক। তাহা না করিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলে, যে খুলিতেছে সে তৎক্ষণাৎ বন্দী হইবে। দুইদিক হইতে দুইটা লৌহখণ্ড স্প্রিঙের জোরে ছুটিয়া গিয়া হাত বাঁধিয়া ফেলিবে। আমার স্ত্রীর অসাবধানতায় সারদা কোনও দিন খুলিবার নামটী জানিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আবার এ ব্যাপাব আছে, তাহা ত সে জানিত না!

পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সুখ নাই। সারদাকে দেখিতে নিরীহ ভালমানুষটি। যাহারা বলে, মানুষের মুখ দেখিয়া, স্বভাব চরিত্রের আভাষ পাওয়া যায়, তাহারা মূর্খের মূর্খ। আইনের ব্যবসায় করিতে করিতে আমি এ থিওরির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলাম; সারদার এই আচরণে আমার বিপক্ষমত স্থায়ী হইয়া পড়িল।

তাহাব কাছে গিয়া রোষকষায়িত নেত্রে বলিলাম—"খুব কায করেছিস্—উপযুক্ত পুত্রের কায করেছিস্।'

রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। সারদা অনুনাসিকস্বরে বলিল—"বাবা, আমার দোষ নেই।"

ইচ্ছা করিল তাহার মুখে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করি। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিলাম।

এই সময়ে আমার স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। সারদাকে তদবস্থ দেখিয়া চমকিত হইলেন। কাঁপিতে লাগিলেন। আমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি কাণ্ড!"

আমার স্ত্রীকে দেখিয়া সারদা দ্বিগুণ ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। আমি রাগিয়া বলিলাম—"চুপ রও শূয়ার—মেরে হাড় গুঁড়ো করে ফেল্‌ব।"

আমার স্ত্রী বলিলেন—"ও ঘরে চল।" বলিয়া আমার হস্তধারণ করিয়া প্রায় টানিয়া লইয়া গেলেন।

একটা কোচে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"কি হবে?"

"কি আর হবে? পুলিসে দেব।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—"দেখ, কায নেই পুলিসে দিয়ে। ছেড়ে দাও। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে এ কায করে ফেলেছে। প্রথম অপরাধের মার্জ্জনা হওয়া উচিত। ও যদি অনুতাপ করে, নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে, তবে ওকে সে অবসর দাও। পুলিসে দিলে ওর জীবন একেবারে মাটি হয়ে যাবে।"

সারদা যদি চুরি করিয়া পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইত, তবে তাহাকে ক্ষমা করা অসম্ভব হইত বটে। কিন্তু সে নাকি অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাই তাহার প্রতি যেন কতকটা দয়া অনুভব করিলাম। কিন্তু সেটা করিলে কি সমাজিক কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় না? স্ত্রীকে সেই কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন—"না; পুলিসে দিলেই সামাজিক কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের উপরই সামাজিক কর্ত্তব্য প্রতিষ্ঠিত। একটা জীবনকে চিরদিনের জন্যে নষ্ট করে দিও না।"

সারদাকে ছাড়িয়া দিলাম।—কলিকাতায় কন্‌গ্রেস হইয়াছিল কবে?—১৮৯৬ সালে। তিন বৎসর পরে সারদার নিকট হইতে সে দিন এক খানা পত্র পাইয়াছি। সে এখন জালালপুর

ম্যুনিসিপালিটিতে ট্যাক্স দারোগার কার্য্য করিতেছে। তাহার মাতুল, তাহার জন্য পাঁচশত টাকা জামিন দিয়া ঐ কাযটি জুটাইয়া দিয়াছেন। কিছুদিন তাহার অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়াছিল, প্রায় ভিক্ষাকে উপজীবিকা করিতে হইয়াছিল। তাহার প্রতি আমাদের "অহেতুক স্নেহ" সম্বন্ধে অনেক কৃতজ্ঞতা পূর্ণ কথা লিখিয়াছে। লিখিয়াছে যে তাহার কাসিটা এবার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। এবার বোধ হয় বাঁচিবে না। ইচ্ছাটা, এখানে আসে কিছুদিনের জন্য। অথচ সে প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতেছে না। তাহার পত্রের শেষ কয় ছত্র এই :—

"যদি আপনার কাছে যাইতে পারিতাম, যদি আবার জননী-দেবীর পাদোদক পান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত আরোগ্য লাভ করিতাম। কিন্তু কোন মুখে আর সে প্রস্তাব করিব? আমার যদি মৃত্যু হয়, তবে সেই শাস্তিই আমার উপযুক্ত।"

আমার স্ত্রী এই পত্রখানি দেখিয়া বলিলেন—"একটা কথা রাখবে?"

"কি?"

"তাকে আসতে লেখ।"

"চাকরি করছে, এখানে এসে কি করবে?"

"ছুটী নিয়ে আসুক।"

"কেন পাদোক জল দেবে বলে?—তার চেয়ে, একটা শিশি করে আউন্স চারেক পাদোক জল পার্শেলে পাঠিয়ে দিলেই হয়।"

"না না—তাকে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি জান, সে এ জীবনের জন্যে আমার কাছে ঋণী? আমার কাছে

যে উপকৃত, তাকে আমার ভারি ভাল লাগে, এটা আমার একটা দুর্ব্বলতা।"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—"আমিই ধন্য যার এমন স্ত্রী, পাদোদক খেয়ে কত লোক জীবন পেয়ে যায়।"

"আহা ঠাট্টা কর কেন ? আমার পাদোদক পান করে সে জীবন পেয়েছে আমি কি বল্‌ছি ? জীবন মানে তার নৈতিক জীবন ভেবে বলেছিলাম। তুমি তাকে পুলিশে দিলে তার কি সর্ব্বনাশ হত বল দিকিন !"

আমি বলিলাম—"নৈতিক জীবন ছাড়া ভৌতিক জীবনও তুমি দিয়েছ তাকে। তুমি পাদোদক না দিলে হয়ত এত দিন সে বাঁচত না।"

আমার স্ত্রী একথা শুনিয়া ভারি হাসিতে লাগিলেন। হাসির অর্থ ভাল বুঝিতে না পারিয়া আমি তাঁহার পানে নির্ব্বোধের মত চাহিয়া রহিলাম। হাসি থামিলে বলিলাম,

"অত হাসছ কেন ?"

"তুমি বুঝি মনে করেছ সারদা আমার পাদোদক খেয়ে ভাল হয়েছে ?"

"তবে কি ? তোমায় প্রণাম করে করে ?"

"না গো না তাও না। একটা রহস্য আছে।"

অত্যন্ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ? কি গা ?"

"প্রথম দু তিন দিন যখন দেখলাম, তার কাসিটা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে তখন জলে পদস্পর্শ করার পরিবর্ত্তে, এ বেলা একটা ও বেলা একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এক ফোঁটা করে স্পর্শ করাতে লাগলাম। ওয়াইনগ্লাসে ওষুধ তৈরি করে টেবিলে

কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দিতাম। সারদা এলে বলতাম—ঐ রেখেছি জল নিয়ে যাও।"

স্ত্রীর বুদ্ধি শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

সারদাকে আসিতে লিখিলাম;—সে লিখিয়াছে—"এ কালামুখ আর আপনাদিগকে দেখাইতে ইচ্ছা নাই।" অগত্যা হোমিও-প্যাথিক ঔষুধ দুইটা কিনিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে পার্শেল ফিরিয়া আসিল। যে দিন প্রভাতে পার্শেল ফিরিল, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাহেব আমার পূর্ব্ব পরিচিত। সারদাকে লেখা আমার পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন—"এর কোনও সন্ধান দিতে পারেন?"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সারদা মিউনিসিপালিটীর বারো হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার স্ত্রী এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

প্রিয়তম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রিয়তমার সঙ্গে তরঙ্গিনীর সম্বন্ধটা একটু অদ্ভুত রকমের, তাহাকে ঠিক সখীত্ব বলা যাইতে পারে না। তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মত আচরণ করিত। তাহাদের পত্র-গুলি প্রেমলিপি ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাতে আদর সোহাগ ও মান অভিমানের প্রাচুর্য্য থাকিত। দেখা হইলে দুইজনে নিভৃত স্থানে গিয়া উপবেশন করিত; কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে তাহাদের মুখে কথা ফুটিত না। তরঙ্গিনী কত-দিন প্রিয়তমার গলাটি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"প্রিয়, ভাই, তুই আমাকে বেশী ভালবাসিস্ না তোর বরকে?" প্রিয়তমা বলিয়াছে—"তোকে।" একদিন প্রিয়তমা তাহার স্বামীর প্রতি অধিক অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছিল, সেদিন আর তরঙ্গিনী অন্ন জল মুখে তুলিল না। কত করিয়া তবে প্রিয়তমা সখীর মান ভাঙ্গাইল। সেই অবধি প্রিয়তমা কপটতাচরণ আরম্ভ করিয়াছে।

তরঙ্গিনী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাহার পরিধানে কালা-পেড়ে দেশীয় সূক্ষ্ম বসন এবং হাতে সোণার চুড়ী আছে বটে, কিন্তু সীমন্তে সিন্দুর নাই। আট বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া নয় বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে।

তরঙ্গিনী যখন প্রথম শ্বশুরগৃহবাসে আসে, তখন সঙ্গিনীর

মধ্যে তাহার ছিলেন শুধু শ্বাশুড়ী ও দিদিশ্বাশুড়ী। প্রিয়তমা তাহাদের প্রতিবেশিনী, কিন্তু তাহার সাহচর্য্য লাভ প্রথমেই হয় নাই, সেও তখন নিজ শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল। প্রিয়তমা ফিরিয়া আসিলে প্রথম সাক্ষাতেই তরঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসিল।

বিধবা বালিকা তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সখীর প্রতি অর্পণ করিল। তাহাকে সে কখনও ডাকিত প্রিয় বলিয়া কখনও বলিত প্রিয়তম। চিঠিতেও তাহাকে প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিত। প্রতিসন্ধ্যায় নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরের সহিত দেখা হইত, তাহা ছাড়া তরঙ্গিনী প্রতিদিন প্রিয়কে চিঠিও পাঠাইত। তরঙ্গিনীর শ্বশুরালয়, কিন্তু প্রিয়তমার পিত্রালয়। প্রিয়তমা মনে করিলেই তরঙ্গিনীর কাছে আসিতে পারিত; প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিতে হইত না। খিড়কী খুলিয়া পুকুরের ধার দিয়া বাগানের ভিতর দিয়া তরঙ্গিনীদের খিড়কী দরজায় উপস্থিত হইবার সুযোগ ছিল। পথ উভয়ের পক্ষে সমান, কিন্তু তরঙ্গিনীর শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহাকে কোথাও যাইতে আসিতে দিতে ভালবাসিতেন না। তাহাতে কিছু ক্ষতি ছিল না; তরঙ্গিনীদের বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও নির্জ্জন হওয়াতে, এইখানেই দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের, আমোদ প্রমোদের, সুবিধা হইত।

তরঙ্গিনীর ভালবাসার অত্যাচার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—কিন্তু প্রিয়তমা সে সমস্ত সকরুণ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিতে থাকিল। সে ভাবিত আমার স্বামী আছে, ভালবাসার পাত্র আছে; আহা তরঙ্গিনীর যে কেহ নাই, কিছু নাই। তাই সব সময় মনে না আসিলেও মুখে তাহাকে আদর করিত।

প্রিয়তমা তরঙ্গিনীকে সচরাচর বলিত তরী ; কখনও বলিত তরণী, কখনও বলিত সাধের তরণী। একবার শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে থিয়েটরে "মৃণালিনীর" অভিনয় দেখিয়াছিল ; সে অবধি মাঝে মাঝে সে তরঙ্গিনার গলাটি ধরিয়া হাসিতে হাসিতে গান করে—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।

প্রিয়তমা শুধু তরঙ্গিনীকে আদর করিয়াই নিষ্কৃতি পাইত না। তরঙ্গিনী যেমন কথায় কথায় তাহার উপর অভিমান করিত, প্রিয়তমাকেও সেইরূপ করিতে হইত। যদি কোনও দিন রাগ না করিত, তাহা হইলে তরঙ্গিনী বলিত—"তোমার ত বয়ে গেল। তুমি কি আমাকে ভালবাস যে রাগ করবে ?" প্রথম প্রথম এই মৌখিক মান অভিমান প্রিয়তমার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইত, কিন্তু ক্রমে সমস্ত বেশ অভ্যস্ত হইয়া গেল। নিতান্ত কর্ত্তব্য পালন করিতেছি বলিয়া আর মনে হইত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তরঙ্গিনী আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গায়িতেছিল,

দারুণ মানেরি ভরে করেছি তার অপমান।

কোথায় সে গেল সখি, আন তারে ডেকে আন।"

তরঙ্গিনীর কণ্ঠবিনিঃসৃত মৃদুতান ভ্রমর গুঞ্জনের মত শুনাইতেছিল। আজ প্রভাতে যখন প্রিয়তমা তরঙ্গিনীর সাক্ষাৎ

করিতে আসিয়াছিল, তখন তরঙ্গিনী রাগে তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই।—প্রিয়তমা কাঁদ কাঁদ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। অন্য দিন তাহারা দিনে দশবার করিয়া নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরকে দর্শন করে; আজ সারাদিন তরঙ্গিনী প্রায় ছাদেই যাপন করিয়াছে, তথাপি একটি বারও প্রিয়তমার দেখা পায় নাই। নিরাশ হইয়া তরঙ্গিনী এইমাত্র ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তরঙ্গিনী একবার ভাবিল প্রিয়কে একখানা চিঠি লিখি। কিন্তু আজ প্রভাতে তাহার অভিমানের কারণ, পূর্ব্ব দিনে লিখিত পত্রখানির উত্তর না পাওয়া। সুতরাং চিঠি লিখিতে তরঙ্গিনী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অথচ সকালবেলার আচরণটা নিতান্তই রূঢ় হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়তমারও কি যথেষ্ট দোষ নাই? প্রিয়তমার স্বামী আসিয়াছে সত্য, তাই বলিয়া কি সে একটি বার ছাদে আসিবারও অবসর পায় না? আর তরঙ্গিনী যে রাগ করিল তা কাহার দোষ? প্রিয়তমারই ত দোষ! কেন সে নিয়মিত সময়ে পত্রোত্তর দেয় নাই? স্বামী কি তাহার হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? না, কলম ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল? না, কালী ফেলিয়া দিয়াছিল?

ক্রমে অন্ধকার হইল। ভৃত্য আসিয়া টেবিলের উপর একটি জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া গেল। তরঙ্গিনী টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, বাক্সটি খুলিয়া, চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম বাহির করিল। একখানি সুন্দর রঙীন কাগজ লইয়া চিঠি লিখিল। তরঙ্গিনী উত্তম লেখা পড়া জানিত। বিধবা হওয়া অবধি ছয় বৎসর কাল সে পিত্রালয়ে ছিল। তাহার দাদা তাহাকে সযত্নে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন;

তিনি ভাবিয়াছিলেন, জ্ঞানচর্চ্চা করিবার অবসর পাইলে দুঃখিনী ভগ্নীটির আজন্মবৈধব্য তবু কিয়ৎ পরিমাণে সহনীয় হইবে।

চিঠিখানি শেষ করিয়া তরঙ্গিনী সে খানিকে খামের মধ্যে পূরিল। শিরোনামা লিখিবার পূর্ব্বে আর একবার ভাবিল চিঠি পাঠাইবে কি না। এ কি পায়ে ধরিয়া মানভিক্ষা করা হইতেছে না?

এই সময় তরঙ্গিনীর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে আরম্ভ করিল। হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ। পনেরো বৎসর বয়স হইতে মাঝে মাঝে তাহার হিষ্টিরিয়া হইতেছে। বেশী অধ্যয়ন অথবা বেশী চিন্তা করিলে, কিম্বা বেশীক্ষণ মন খারাপ করিয়া থাকিলে, এই রোগ তাহাকে আক্রমণ করিত। আজ ত সারা দিনটা সে মন খারাপ করিয়া আছে। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়াছিল, রোগ আসন্ন জানিতে পারিলে শীতল জল পান করিবে এবং মুখে চক্ষে শীতল জলের ঝাপ্টা দিবে। ঘরের কোণে জল রাখা ছিল, তরঙ্গিনী জল পান করিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। কিন্তু আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না। চেয়ারে বসিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। ক্রমে চেয়ার সুদ্ধ সশব্দে মেঝেতে পড়িয়া গেল।

তরঙ্গিনীর এই ব্যাধি আছে বলিয়া, বাটীর লোক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। পাশের ঘরে এক দাসী ছিল, সে শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নে সংবাদ দিল।

গত কল্য তরঙ্গিনীর খুড়শ্বশুর স্ত্রী পুত্র লইয়া বাটী আসিয়াছেন, পুত্র সুধীরচন্দ্রের শুভ উপনয়ন।

তরঙ্গিনীর শাশুড়ী তখন মাকে লইয়া পাল্কী করিয়া সুধীরের

উপনয়নে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছেন। বাড়ী ছিলেন শুধু নবাগতা ছোটকাকী। তিনি ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার এক বোনের হিষ্টিরিয়া আছে; মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার নিয়মাদি সব তাঁহার জানা ছিল। ঝির সাহায্যে তরঙ্গনীকে উঠাইয়া পালঙ্কের উপর শয়ন করাইলেন এবং চেতনা সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। হঠাৎ নিকটস্থ টেবিলের উপর রঙীন্ খামখানির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দক্ষিণ হস্তে তরঙ্গিনীকে পাখা করিতে করিতে, বাম হস্তে খামখানি তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলির সাহায্যে চিঠিখানি বাহির করিয়া খামখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। চিঠির ভাঁজ খুলিয়া আলোকে ধরিয়া পড়িলেন—প্রিয়তম।

তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত পা অবশ হইয়া আসিল। নিশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। ঝিকে বলিলেন— "তুই বাতাস কর আমি শীগ্গির আস্‌ছি।" বলিয়া পাখা ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

ইহাঁর স্বামী হৃদয়নাথ মীরাটের প্রধান ডাক্তার। বিলক্ষণ উপার্জ্জন করেন। লোকটি পরম হিন্দু। এক সময়ে নাকি গোমাংসও ইহাঁর উদরস্থ হইয়াছিল; কিন্তু সে সব ভূত-কথা। আপাততঃ তাঁহার মস্তকে একটি প্রকাণ্ড শিখা দোদুল্যমান। স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী। ইহাঁর প্রথমা পত্নী পরলোকগতা। সুধীর সেই প্রথমার গর্ভজাত। দ্বিতীয় সংসারটি এখনও কোনও সন্তান সন্ততি সংসারে আনিতে কৃতকার্য্য হন নাই। আর বড় আশাও নাই কারণ ইহাঁর বয়ঃক্রম এখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইয়াছে।

হৃদয়নাথ একটি ঘরে একাকী বসিয়া কি লিখিতেছিলেন, সহসা তাঁহার পত্নীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রী, চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"পড়।"

হৃদয়নাথ চশমা আঁটা চক্ষু দুইটি স্ত্রীর পানে ফিরাইয়া বলিলেন—"ব্যাপারখানা কি?"

"দেখনা পড়ে।"

"কে লিখেছে?"

"যেই লিখুক—দেখ না।"

হৃদয়নাথ চিঠিখানি অনুচ্চস্বরে পাঠ করিলেন:—

প্রিয়তম,

তুমি এমন নিষ্ঠুর! এই তুমি আমায় ভালবাস? আমি যদি রাগ করি, অভিমান করি, তাহা হইলে কি তুমি সে অভিমান ভাঙ্গাইবে না? ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? কাল সকালে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তার জবাব দাও নাই কেন? তাই ত আমি রাগ করিয়াছিলাম, তাইত তোমার সঙ্গে দেখা হইলে ভাল করিয়া কথা কহিলাম না। আমি কেন রাগ করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জানিতে না? যদি না জানিতে, তবে জিজ্ঞাসা করিলেও ত পারিতে। তুমি চলিয়া গেলে পর আমার ভারি কষ্ট হইল। আজ প্রায় সারাদিন আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছাদে কাটাইলাম, তুমি তোমাদের ছাদে আসিলে না কেন? শেষে আমিই মান খোয়াইয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমি যদি আমার বেদনা বুঝিবে না, তবে কে বুঝিবে

প্রিয়তম ? তোমার সাধের তরণী বুঝি পুরাণো হইয়াছে, তাই এ অনাদর ?

তোমারই।

চিঠি পড়িয়া হৃদয় নাথ বলিলেন—"এ কার চিঠি ?"

"কার আবার, মেঝ বউয়ের।"

"আমাদের মেঝ বউমার ?"

"হাঁ গো হাঁ, তোমাদের মেঝ বউমার। সর্ব্বনাশী শেষে এই করলে ? কুলে কালী দিলে ? এ ত আমি তখনি জানি। যার কপাল পুড়েছে, তার আবার কালাপেড়ে কাপড় পরা কেন ? গহনা পরা কেন ? পাণ খাওয়া কেন ?——"

স্ত্রীর বক্তৃতা-স্রোতে হৃদয়নাথ বাধা দিয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি ঠিক জান এ তাঁরই হস্তাক্ষর ?"

"তোমার কথা শুনে গা জ্বলে যায়। এ আবার নতুন করে জান্‌তে হবে না কি ? আজ চার বচ্ছর ধরে যে কালামুখী আমায় চিঠি লিখ্‌ছে।"

"তা হলে, এখন কি হয় ?"

"কি হয়, ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদায় করে দাও। কাশীতে পাঠিয়ে দাও।"

"লোকে শুন্‌বে না ?"

"লোকের কি শুন্‌তে বাকী থাকবে ? তুমি কার মুখে সরা চাপা দেবে ?

হৃদয়নাথ স্ত্রীর হস্তে পত্রখানি প্রত্যর্পণ করিয়া কিয়ৎকাল

চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখ, বোধ হয় তা না, এমনটাই কি হতে পারে?"

"না তা কি আর হতে পারে? তুমি যেমন ভাল মানুষটি, সবাইকে নিজের স্ত্রীর মত সতী লক্ষ্মী মনে কর।"

হৃদয়নাথের ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য একটু মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। বলিলেন—"দেখ, আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না যে বউমা পাপে ডুবেছেন। আর, যদি তুমি যা বলছ তাই হয়, তা এখনও হয়ত উনি ধর্ম্মচ্যুত হন নি, হবার উপক্রম হয়েছে মাত্র।"

"উপক্রম হয়েছে মাত্র বৈ কি! তুমি বুঝি ভেবেছ শুধু চিঠিপত্র চলেছে?"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

"যেমন তোমার বুদ্ধি, তার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কেন চিঠিতে ত স্পষ্ট লেখাই রয়েছে?"

"কি লেখা রয়েছে?"

"তবে কি পড়লে চিঠি? তুমি ত নিজে পড়েছ, আমি শুধু শুনেছি। চিঠিতে ত লেখাই রয়েছে 'তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন ভাল করে কথা কইলুম না।' শুধু কি চিঠিই চলেছে? দেখা শুনো হয়েছে সব হয়েছে।"

এই সময় ঝি আসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সংবাদ দিল—"ছোট মা শীগগির এস গো, মেঝ বউমা বড্ড কি রকম কর্‌ছেন।"

ছোট গিন্নি ঝির সহিত চলিয়া গেলেন। হৃদয়নাথ একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হৃদয়নাথের প্রকৃতিটি কিছু শীতল। তাঁহার মনোবৃত্তিগুলি সহসা উত্তেজিত হয় না; কোনও একটা বিষয়ে সহসা তিনি বিশ্বাসস্থাপন করেন না।

কিন্তু যে প্রকারে হউক, একবার তিনি জাগ্রত হইলে, কোনও বিষয়কে সত্য বলিয়া স্থির করিলে, আর কিছুতেই তাহা হইতে স্খলিত হন না। ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে আজন্মবিধবা, সংসারের শতপ্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা তাহার পক্ষে একান্ত কঠিন বটে। তাহাতে আবার তরঙ্গিনী লেখা পড়া জানে। স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে যে সমস্ত তর্ক উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে একটি এই যে, স্ত্রীলোকে লিপিলিখনসক্ষমা হইলে সমাজে অপবিত্র প্রণয়ের প্রসার বৃদ্ধি হইবে। হৃদয়নাথ স্বচক্ষে ইহার প্রমাণ দেখিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিদ্বেষ তাঁহার মনকে তরঙ্গিনীর বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে বিষাক্ত করিতে লাগিল। ভাবিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইহা বলা উচিত কি না। না বলিলে ত প্রতীকারের কোনও সম্ভাবনা নাই। এখানে তরঙ্গিনীকে রাখা আর কোনও মতে চলিতে পারে না। অদ্যিও জানাজানি হয় নাই; কিন্তু ব্যাপার যেরূপ গড়াইয়াছে, তাহার ত আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন যে সমাজে মুখ দেখান দুষ্কর হইবে। পুত্র কন্যাগণের বিবাহ দেওয়া কঠিন হইবে। উহাকে স্থানান্তরে পাঠাইলেই বা ফল কি? যেখানে যাইবে, সেখানেই মরিবে।

যখন রাত্রি আটটা বাজিল, তখন বড় গৃহিণী ও তাঁহার জননী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বধূগত প্রাণ। তরঙ্গিনীর মূর্চ্ছা সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ উপরে গেলেন। গিয়া দেখেন তখনও মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই। ঝি ও ছোটগিন্নি তাহার শুশ্রূষা করিতেছে।

এমন ত কখনও হয় না, এতক্ষণ্‌ত মূর্চ্ছা কখনও থাকে না। এ কি সর্ব্বনাশ হইল!

কখন মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, সমস্ত খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহিণী বলিলেন—"ভারি অন্যায় হয়েছে।" ছোট গিন্নীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, অতক্ষণ ধরিয়া একা ঝির হাতে রোগীকে সমর্পণ করিয়া যাওয়া ভাল হয় নাই। ঝি বলিল—"বাছা, আমার গায়ে কি ক্ষ্যামতা আছে? আমি কি একলা ওঁয়াকে ধরে রাখ্‌তে পারি? হাত পা ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে গড়িয়ে খাট থেকে দড়াম করে পড়ে গেলেন, সেই অবধি মুখে একটু একটু রক্ত উঠ্‌ছে।"

ক্রমে কর্ত্তা বাড়ী অসিয়া সকল শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন "হৃদয় তুমি এতক্ষণ কি কর্‌ছ?—যাও যাও, কিছু বিহিত কর। ক্রমেই যে কেস্ খারাপ হয়ে যাচ্চে।"

হৃদয়নাথ অনিচ্ছুকের মত রোগিনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষার পর বলিলেন, পড়িয়া গিয়া হৃৎপিণ্ডস্থ রক্তকোষে আঘাত লাগিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তরঙ্গিনীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রিয়তমার স্বামীর নাম অনঙ্গমোহন। গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হওয়ায় সে কল্য প্রভাতে শ্বশুরবাড়ীতে অসিয়াছে। তরঙ্গিনীর সহিত প্রিয়তমার সখীত্ব সংবাদ সে পত্রেই পাইয়াছিল। মিলনের প্রথমরাত্রে তাহারা পরস্পরকে লইয়া বিভোর, তরঙ্গিনীর কথা কহিবার অবসর পায় নাই। পরদিন রাত্রি দশটার সময় প্রিয়তমা স্বামীর নিকট আসিল। প্রথম কথাবার্ত্তার পরই অনঙ্গ বলিল—"তোমার তরঙ্গিনীর চিঠিপত্র দেখাও না।"

প্রিয়তমা বলিল—"সে কি দেখাতে পারি? সে যে বারণ করে দিয়েছে কারুকে দেখাতে।"

অনঙ্গ বলিল—"আমি বুঝি কারুর মধ্যে গণ্য হলাম! আমাকে দেখাতে হবে।"

প্রিয় বলিল—"তবে তরীকে জিজ্ঞাসা করি আগে।"

"সে যদি হুকুম না দেয়?"

"না দেয় ত কেমন করে দেখাব?"

অনঙ্গ রাগ করিল। বলিল—"না দেখাও না দেখাবে। আমি তোমার পর, সেই তোমার আপনার।"

প্রিয়তমা এ কথায় প্রতিবাদ না করিয়া নীরব হইয়া রহিল। পরদিন গিয়া সে তরঙ্গিনীকে সব কথা বলিল। তরঙ্গিনী বলিল—'না ভাই না ভাই, লক্ষ্মীটি আমার, তোর পায়ে পড়ি, চিঠি তাঁকে দেখাস্‌নে।"

সে রাত্রে অনঙ্গমোহন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি. হল? হুকুম পেলে?"

প্রিয় বলিল—"না সে ত কিছুতেই রাজি হয় না।"

ইহাতে তাহার স্বামী ভারি অভিমান করিল। আজকালকার দিনে লিখিতে লজ্জা করিতেছে—আমাদের স্ত্রীবৎসল যুবা নায়কটি বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

প্রিয়তমা তখন বাক্স হইতে চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল—"ওগো দেখ গো দেখ। অত দুঃখুতে কায নেই।"

অনঙ্গ চিঠির বাণ্ডিল দূরে ফেলিয়া দিল। বলিল—"যাও আমি দেখ্‌তে চাইনে।"

এই অপমানে প্রিয়তমা মর্ম্মাহত হইল। মেঝের উপর বসিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ তাহাকে তদবস্থ থাকিতে দেখিয়া অনঙ্গের রাগ ভাঙ্গিল। স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিল—"ওগো কাঁদতে হবে না।"

ইহাতে প্রিয়তমা আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ তখন নানা প্রকারে স্ত্রীকে আদর করিয়া সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। চিঠির বাণ্ডিলটি কুড়াইয়া আনিয়া, প্রথম চিঠিখানির ঠিকানার প্রতি চক্ষু রাখিয়া বলিল, "তরঙ্গিনীর ত হাতের লেখাটি বেশ, না?"

"খাসা লেখা, ঠিক পুরুষ মানুষের মত।"

"আচ্ছা তুমি দু চারখানি ভাল ভাল চিঠি বেছে দাও, আমি পড়ি।"

প্রিয়তমা একখানি নির্ব্বাচন করিয়া বলিল—"এইখানা পড়।"

অনঙ্গ যতক্ষণ সে খানি পড়িতে লাগিল, প্রিয়তমা ততক্ষণ আরও খান কয়েক চিঠি বাছিয়া বাছিয়া স্বামীর হাতে দিল।

অনঙ্গ সবগুলি একে একে পড়িয়া, মুখখানি বিমর্ষ করিয়া রহিল। প্রিয়তমা জিজ্ঞাসা করিল—"ভাবছ কি ?"

অনঙ্গ বলিল—"দেখ, তুমি আর তোমার সখীর সঙ্গে ভাব রাখতে পাবে না।"

"কেন ?"

"না। এ যে রকম চিঠি, তাতে যদি আমি সব না জানতাম ত মনে করতাম প্রণয়ের চিঠি।"

"কেন, সখীতে সখীতে প্রণয় কি দোষের ?"

"দোষের কি না সে বিচারে কায নেই। আমি ছাড়া আর কাউকে তুমি ভালবাসতে পাবে না। কোনও সখীকে এত দূর ভালবাসলে আমার প্রাপ্য ভালবাসার অংশে কম পড়ে যাবে।"

প্রিয়তমা হাসিয়া বলিল—"তুমি পাগল নাকি ?"

"হাসির কথা নয়, আমার প্রাণটা কেমন কর্‌ছে এ সব চিঠি পড়ে। সখীতে সখীতে এ রকম চিঠি লেখা লিখি করে কস্মিনকালে আমি স্বপ্নেও জানতাম না।"

"সে যে নিত্যি আমায় চিঠি লেখে, তাকে জবাব না দিলে সে আবার রাগ করবে।"

"তা করে করুবে।"

"তার আবার যে অভিমান; কথায় কথায় অভিমান করে। কাল আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল; অবসর পাইনি বলে তার জবাব দিতে পারিনি; রোজ সন্ধে বেলা ছাদে উঠি, দুজনে দেখা হয়। কাল সন্ধে বেলা আর সে ছাদে পর্য্যন্ত উঠল না। সকাল বেলা আজ কাউকে না বলে কয়ে তাদের ওখানে গিয়েছিলাম; আমার সঙ্গে কথাই কইলে না, এত রাগ। আমি

বল্লাম—'ভাই কেন রাগ করিস্—জানিস ত, অবসর পাইনে।" বল্লে জানি গো জানি তোমার স্বামী এসেছেন। তাই তুমি অবসর পাও না। আমরা বিধবা মানুষ আমাদের সদাই অবসর।'—কথাটা শুন্‌তে আমার এমন খারাপ লাগল; আমি চলে এলাম। আমিও আজ ছাদে যাইনি, প্রতিশোধ নিচ্চি। কেন, আমি কি রাগ করতে জানিনে?"

* * * * *

ভোর রাত্রে এই দম্পতি সেইমাত্র জাগিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছিল। প্রিয়তমার মা দুয়ারের কাছে আসিয়া ডাকিলেন "পিরি।"

প্রিয়তমা উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। মা বলিলেন—"শোন্ একটা কথা বলি।"

মার কণ্ঠস্বরে ও ভাবভঙ্গীতে প্রিয়তমা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা? কি হয়েছে?"

মা তাহাকে বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া বলিলেন—"তন্নীর বড় ব্যামো। তোকে তাদের ঝি ডাক্‌তে এসেছে।"

প্রিয়তমা রুদ্ধশ্বাসে বলিল—"কি ব্যামো মা? কৈ ঝি?"

"ওঘরে বসে রয়েছে। আয়। তোকে নিয়ে যেতে চাচ্চে।"

মাতা কন্যাতে একটি ঘরে প্রবেশ করিল। তরঙ্গিনীদের ঝি দাঁড়াইয়াছিল। প্রিয়তমাকে দেখিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিদিমণি, মেজবউ আর বুঝি বাঁচে না। তোমাকে দেখতে চাইছে। যখন জ্ঞান হচ্চে, তখনি শুধু তোমার নাম করে ডাক্‌ছে। চল শীগ্‌গির।"

ঐ সংবাদ শ্রবণে প্রিয়তমার হস্ত পদ ঠক্ ঠক্ করিয়া

কাঁপিতে লাগিল। জননীর অনুমতি লইয়া ঝির সহিত সে তরঙ্গিনীর কাছে চলিল।

যখন তরঙ্গিনীদের বাটীর দরজায় পৌঁছিল, তখন ক্রন্দনের রোল তাহাদের কর্ণে গেল। ঝি বলিল—"যাঃ সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গো! হায় হায় হায়।"

প্রিয়তমা সদর হইতেই ফিরিল। ঝির কাঁধে ভর দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এক মাস পরে হৃদয়নাথ বাটীর সকলকে লইয়া মীরট যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে রহিলেন কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তাঁহার শ্বাশুড়ী।

জ্যৈষ্ঠ মাস, মীরটে দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সূর্য্যদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দিন অগ্নিবর্ষণ করেন। সহরের রাস্তাপথে লোকচলাচল দশটা বাজিলেই কমিতে আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে সমস্ত দোকান পাট বন্ধ; রাজপথ লোকশূন্য, নীরব শ্মশানের ন্যায় মনে হয়। আফিস আদালত ইত্যাদি সমস্তই প্রভাতে। সেই আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথে মানুষ বাহির হয়।

একটি অন্ধকারপ্রায় ঘরে, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, হৃদয়নাথ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বাড়ীতে যতগুলি ঘর আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এইটিই শীতল, তাই মধ্যাহ্নকালে পরিবারস্থ সকলেই এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। দুয়ার ও জানালা খস্‌খসের পরদা দিয়া রুদ্ধ। ঘরের ভিতরেই বসিয়া এক

ছোঁড়া চাকর পাখা টানিতেছিল। দূরে ছোটবধূ ছেলেপিলেকে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছিলেন। বড়বধূ ধোয়া শানের মেঝেতে একটি বালিস মাথায় দিয়া শুইয়া দেবরের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। ক্রমে তরঙ্গিনীর কথা উঠিল। বড়বধূ দুঃখ করিয়া বলিলেন—"আহা বাছা যে এমন করে দাগা দিয়ে যাবে, তা আমি কখনও ভাবিনি।"

হৃদয়নাথ বলিলেন—"বড়বউ তার জন্যে আর দুঃখ করে কি হবে? যা হবার তা হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকলেও সুখ হত না।"

বড়বধূ বলিলেন—"কেন এ কথা বলছ ঠাকুরপো?"

"অনেক দিন থেকে একটা কথা বলব বলব মনে করি, কিন্তু বল্‌তে পারিনে বড় বউ। তিনি গিয়েছেন, সে সকল দিক থেকেই ভাল হয়েছে।"

বড়বধূ কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা ঠাকুর পো? কি হয়েছিল?"

হৃদয়নাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আর কি বলব মাথা মুণ্ডু। তাঁর স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়েছিল।"

এ কথা শুনিয়া বড় বধূ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন—"ও কি কথা ঠাকুর পো! অমন কথা বোলোনা। তিনি আমার সতী লক্ষ্মী ছিলেন।"

হৃদয়নাথ দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন—"বড় বউ—আমি স্বচক্ষে তাঁর হাতের চিঠি দেখেছি।"

"কি চিঠি?"

"সে আর কি বলব?"

"কাকে লেখা?"

"তা ত জানিনে, কে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে তা ঈশ্বরই জানেন।"

বড় বধূ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর পো ভুল করেছ। তা হতেই পারে না।"

হৃদয়নাথ পূর্ব্ববৎ ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন—"চিঠি যে আমার কাছে রয়েছে বউ।"

"কই দেখি।"

হৃদয়নাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া চিঠি বাহির করিলেন। বড় বধূ তাঁহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া জানালার কাছে গেলেন। খস্‌খসের পরদা ফাঁক করিয়া আলোকে চিঠিখানি এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখিলেন। তাহার পর শয্যায় ফিরিয়া আসিয়া চিঠিখানি হৃদয়নাথকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন—"তবু ভাল। দেহে প্রাণ এল।"

হৃদয়নাথ পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কেন?"

বড়বউ ধীরে ধীরে বলিলেন—"ও তো তার সখী প্রিয়তমাকে লেখা। সেই ও বাড়ীর চাটুয্যেদের পিরি, তার সঙ্গে ভারি ভাব ছিল কি না। রোজ দুজনে চিঠি লেখালিখি করত। আহা পিরি ছুঁড়ি শ্বশুরবাড়ী যাবার দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল; কেঁদে আর বাঁচে না।"

হৃদয়নাথের কপাল ঘামিয়া উঠিল। নিশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। বলিলেন—"তবে চিঠির উপরে 'প্রিয়তম' লেখা রয়েছে কেন?"

"ঐ বলেই ত সে ডাকত। পিরি ওকে বলত তরুণী, সে পিরিকে বলত প্রিয়তম।"

হৃদয়নাথের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। আলোকাভাবে কেহ তাঁহার মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন আপনা আপনি বলিলেন—"হায় রে, এ কথা যদি আগে জানতাম!" বড়বধূ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আগে জানলে কি হত ঠাকুর পো? তা হলে তাকে ধরে রাখতে পারতে? তাই কি তার চিকিৎসায় তেমন মনোযোগ করনি?"

হৃদয়নাথের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

বড়বধূ বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"তবে কি চেষ্টা করলে তাঁকে বাঁচাতে পারতে ঠাকুর পো?"

হৃদয়নাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বড়বউ, যার নিয়তি উঠেছে, মানুষের চেষ্টায় কি তাকে বাঁচান যায়? অদৃষ্ট-লিখন খণ্ডন করা কি মানুষের সাধ্য?"

বড়বধূর মন এ উত্তরে সন্তোষ মানিল না। তিনি আজিও নির্জ্জনে তরঙ্গিনীকে চিন্তা করিতে করিতে নানা কথা ভাবেন।

বন্য-শিশু

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রচুর পরিমাণে শীতবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ১লা ডিসেম্বর কুমুদনাথ স্ত্রী ও দুই বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে সিমলা যাত্রা করিলেন। শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীকৃত পঞ্জিকাবৃত্ত সে দিনটি যাত্রার পক্ষে শুভতম বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া অলখনিরঞ্জন মানুষের গণনায় কখন কি উলটপালট করিয়া দিলেন, গ্রহগণের অবস্থানের কোথায় কি বিপর্য্যয় ঘটাইলেন, কেহ জানে না। এই দম্পতির পক্ষে এমন অশুভ-ক্ষণে যাত্রা জীবনে আর ঘটে নাই।

বৎসর খানেক ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া কুমুদ-নাথের দেহখানি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার বলিল,—"আপনি পশ্চিমে গিয়ে শীতঋতুটা যাপন করে আসুন।"

কুমুদ বাবুর স্ত্রীর নাম গিরিবালা। সিমলাপাহাড় তাঁহার জন্মস্থান। নয় দশ বৎসর বয়স অবধি তিনি সিমলায় ছিলেন—তাঁহার পিতা ৺কালীকান্ত মিত্র মহাশয় সিমলায় কর্ম্ম করিতেন। তিনি স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন—"সিমলা চল।"

কুমুদনাথ বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! এই শীতে সিমলা?"

"ওগো যত ভয় করছ তত কিছুই নয়। সিমলায় শীত

ভারি সুন্দর। বরফপড়া ত কখনো দেখনি, তাও দেখ্‌বে, সে অতি চমৎকার জিনিষ।"

কুমুদ বাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন —"ক্ষতি নেই, সে বরং আরও ভাল। তবে যদি খুব সাবধানে থাকতে পারেন।"

ডাক্তারের উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালনপূর্ব্বক তাঁহারা যাত্রা করিলেন। তিন সপ্তাহকাল মহা আনন্দে সিমলায় কাটিল। সিমলা কালেকটরী আফিসে কুমুদনাথের একটি সতীর্থ ছিলেন— যদুবাবু। তিনি একটি সুন্দর দ্বিতল বাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কুমুদনাথ প্রথম প্রথম বেশী চলাফেরা করিতে পারিতেন না। কখন সোফায় শুইয়া সিম্‌লা গাইডবুক হাতে সিম্‌লার সর্ব্বত্র কল্পনায় পর্য্যটনের সুখ অনুভব করিতেন, কখন বা বাতায়নের ধারে চৌকি পাতিয়া রাজপথে ভারবাহী উষ্ট্রশ্রেণী, একা, টোঙ্গা কিম্বা ঝাপানের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেন। ভারি আনন্দ বোধ হইত,—সবই নূতন। বিশেষতঃ একটা দুধেআল্‌তায় বর্ণের পাহাড়ী মুখ দেখিলে কুমুদনাথের পরিতৃপ্তির সীমা থাকিত না। অদূরে কোন খদের গায়ে সিঁড়ির মত থাক্‌ থাক্‌ কাটা শস্যক্ষেত্র, পাহাড়ীদের কুটীর, তাহাদের বেশভূষা, তাহাদের আকার প্রকার এ সবেরই প্রতি কুমুদ বাবু কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতেন।

আবার নূতন বিস্ময়! ২০শে ডিসেম্বর ভাল রকম একটা তুষারপাত হইয়া গেল। কুমুদবাবু তাঁহার শিশু পুত্রেরই মত আনন্দে অধীর। গিরিবালা প্রসন্ন হাস্যে স্বামীর আনন্দে আনন্দিত হইলেন।

আজ ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিন। প্রাতে ৮টার সময় যদুবাবু আলষ্টার গায়ে দিয়া, বুটের উপর পটি বাঁধিয়া, সুদীর্ঘ "বরফের লাঠি" হাতে করিয়া বালুগঞ্জে কুমুদবাবুর বাসায় আসিয়া দর্শন দিলেন। কুমুদনাথ তখন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিতেছেন। দেখা হইবামাত্র যদুবাবু সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন? গায়ে একটু বল পেলেন?"

"হাঁ, অনেকটা উন্নতি দেখ্‌তে পাচ্চি। দু বেলায় আধ সের তিন পোয়া মটন হজম করছি।"

যদুবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, যেন ভারি নিরাশ হইয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন—"মোটে আধসের তিন পোয়া? তাও দুবেলায়?"

কুমুদ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"মশায়, কাল ওবেলা আমাদের এখানে আপনার নেমন্তন্ন রইল।"

যদুবাবু লোকটি বড় ভালমানুষ। একটু ঘুরান কথা হঠাৎ বুঝিতে পারেন না। বালকের মত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—"কি? কি?"—বলিয়া দিলে,তখন বালকেরই মত হা হা করিয়া হাসিয়া আকুল হন। নিমন্ত্রণ করায় বলিলেন—"কেন বলুন দিকি? হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই নেমন্তন্ন করে বসলেন যে?"

কুমুদ বাবু বলিলেন—"আধসের তিন পোয়া মাংস খাই শুনে নিরাশ হলেন, আপনি কত খান সেইটে আমি দেখতে চাই।"

যদুবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই সময় ভৃত্য চা আনিল।

হাসি থামিলে যদু বাবু বলিলেন—"আমি একবেলায় একসের দেড়সের অনায়াসে পার করি। এখনআর বেশী পারিনে; পূর্ব্বে

যখন নীচে রাবলপিণ্ডিতে ছিলাম, একবার সখ হয়েছিল ভেড়ার মাথা খাবার। প্রত্যহ একটা করে এতবড় ভেড়ার মাথা ক্রমাগত চল্লিশ দিন খেলাম। চল্লিশ দিনের পর, চর্ব্বিতে গা ফাটতে লাগল। একজন ডাক্তার ছিল, সে বারণ করলে। বল্লে গায়ে বেশী চর্ব্বি হলে হৃদ্‌রোগে মারা পড়বে।”

কুমুদনাথ শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলেন। বলিলেন —“কাল আপনার জন্যে একটা ভেড়ার মাথাও প্রস্তুত থাকৃবে।”

দুইজনে আরাম করিয়া অতি উষ্ণ চা পান করিতে লাগিলেন। যদুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“খুব বেড়াচ্ছেন ত?”

“হাঁ—খুব নয়; তবে বেড়াচ্চি বৈ কি। কাল জ্যাকো প্রদক্ষিণ করে এসেছি।”

“আর একটু সবল হোন্‌, তার পর আমি আপনাকে নিয়ে বেড়াব। এখন আপনি পারবেন না আমার সঙ্গে, হাঁপিয়ে পড়বেন।”

প্রথম পাত্র নিঃশেষ করিয়া যদুবাবু দ্বিতীয় পাত্র চা গ্রহণ করিলেন। এতক্ষণ ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল, বাহিরে আলো হইয়াছে দেখিয়া ভৃত্য সার্সির উপর হইতে পরদা সরাইয়া দিল, বাতি নিবাইল।

দ্বিতীয় পাত্র নিঃশেষ করিয়া যদুবাবু বিদায় চাহিলেন।

কুমুদবাবু বলিলেন—“বসুন না, অত তাড়াতাড়ি কি?”

“একটু কায আছে?”

“যোগ টোগ নাকি?”

যদুবাবু যে গোপনে যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন, এ কথা সিমলার সকলেই অবগত আছেন।

সলজ্জ হাসি হাসিয়া যদুবাবু বলিলেন—"সে সব হয়ে টয়ে গেছে।"

"তবে?"

"আজ একটু অন্য কায আছে। সকাল সকাল খেয়ে, এক-বার তারাদেবী যেতে হবে। মেয়েরা অনেক দিন থেকে ধরেছে।"

"তারাদেবী যাবেন? তা আমায় বলেন নি কেন? আমারও স্ত্রী যে এসে অবধি একদিন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। কতদূর বলুন দেখি?"

"এই ছ সাত মাইল।"

"রিক্‌শ যায়?"

"নীচে অবধি যায়, টিব্বেতে অবশ্যি কি করে উঠবে?"

"কখন বেরুলে সন্ধের মধ্যে ফেরা যায়?"

"বারোটার সময় বেরুলে যথেষ্ট।"

সমস্ত পরামর্শ ঠিক হইল। যদুবাবু বলিলেন, আরও সকালে —১১টার সময়—বাহির হওয়া ভাল। আজ সৌভাগ্য ক্রমে আকাশটাও বেশ পরিষ্কার আছে। বিগত তুষারপাতের পর পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে—তুষার গলিয়া শুকাইয়া পথও বোধ হয় পরিষ্কার হইয়া গিয়া থাকিবে।

যদুবাবু বলিলেন ১১টার সময় তাঁহাদের রিক্‌শ এবং ইহাঁদের জন্য তিনখানি খানি খালি রিক্‌শ (একখানি খোকার চাকরের জন্য) আসিয়া উপস্থিত হইবে। বলিয়া তিনি বরফের লাঠি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে মস্ মস্ শব্দে অন্তর্হিত হইলেন।

কুমুদবাবু ভাবিতে লাগিলেন—"বাস্‌রে! একটা যেন অসুর বিশেষ! কি কর্‌লে অমন হওয়া যায়?"

কিয়ৎক্ষণ পরে এই কক্ষে গিরিবালা আসিলেন। তিনি কিন্তু তারাদেবী যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া ততটা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন—"আবার সঙ্গী যোটালে কেন? আমরা দুজনে যেতাম। তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পাব না। কিছুই নয়।" কুমুদবাবু বলিলেন—"বিদেশে সঙ্গীহীন হয়ে কোথাও যাওয়া কিছু নয়,—আর ওঁরা সব জানেন শোনেন; ভাল করে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন।" গিরিবালা মৃদুস্বরে বলিলেন—"আমি এখানকার সব জানি সব চিনি।"

তখন বেলা প্রায় ১০টা। ইহাঁরা ক্রমশঃ স্নানাহার শেষ করিলেন। খোকাকে দুধ খাওয়ান হইল। তাহাকে কাজল পরান হইল। সাজসজ্জা হইল।

সাড়ে এগারোটার সময় যদুবাবুরা ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাত্রা করিবার সময় গিরিবালার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হয় নাই, ভাবী অমঙ্গলের কোন সূচনাই তাঁহাকে চঞ্চল করে নাই। তথাপি কেমন বিষণ্ণ মন হইয়া রহিলেন। এখন যখনি এই তারাদেবী যাত্রা ঘটনা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হয়, সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠে।

সিমলার সীমা পার হইয়া কুমুদবাবু রিকৃশ হইতে অবতরণ করিয়া যদুবাবুর সহিত পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বধূদের সাধ হইল, তাঁহারাও হাঁটিয়া যাইবেন। নামিলেন; কিছু দূর যাইতে না যাইতেই পরিশ্রান্ত হইয়া আবার রিকশায় উঠিলেন। যদুবাবু সহাস্য মন্তব্য করিলেন—"মেয়েদের কোন ক্ষমতাই নেই, কেবল সকল কাযেই একটা আঁকুপাকু আছে। এই পাহাড়ে পথে চলা কি ওদের কায!"

গিরিবালা সঙ্গিনীদের সহিত হাস্যালাপে আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে আর কোন বিষণ্ণতা নাই।

দুইটার সময় তারাদেবীতে রিকৃশ পৌঁছিল। সে একটা পর্ব্বত চূড়া। স্বীয় পাদমূল হইতে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ। রিকৃশ ছাড়িয়া ইহাঁরা চূড়ারোহণ আরম্ভ করিলেন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে পাথরে সিন্দূর মাখান তারাদেবী বিগ্রহ। দেখিলে ভীতির সঞ্চার হয়। মেয়েরা পূজা আদি করিলেন। পুরুষ দুইটি চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া স্বভাবের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। একদিকে গভীর খদ, অন্যদিকে সমুচ্চ অরণ্যাণী। অত্যন্ত নির্জ্জন, ভাবুকজনপ্রিয় স্থান। অদূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। মধ্যাহ্নের অতি প্রখর রৌদ্রে অতি ঔজ্জ্বল্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

মন্দিরের পূজারী বাবাজী ইহাঁদের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল। বাবাজীর বাড়ী জিলা হোসিয়ারপুর। কিরূপ আয় হয়? সে অতি সামান্য। পাহাড়ীয়াগণ প্রায়ই পয়সা কড়ি দেয় না; কেহ বা গোধুম, কেহ বা আলু, কেহ বা মধু দিয়া যায়। বড়লোক, দলপতি, রাজা মহারাজা আসিলে একদমে অনেক লাভ হইয়া যায়। জলের বড় কষ্ট। নীচে বাউলিতে ঝরণার জল সঞ্চিত থাকে সেইখান হইতে কলসী ভরিয়া লইয়া আসিতে হয়। এই সময়, অদূরে চিড়বৃক্ষের তলে, শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনা গেল। একটা পাহাড়িয়া শিশু রৌদ্রে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, সে উঠিয়া বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে।

তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুরোহিত বলিল—"বাবুজী আজ দুই দিন ইহাকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছি।"

বন্ধুদ্বয় ধীরে ধীরে শিশুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার গায়ে কিসের চামড়ার একটা জামা। মাথায় সলোম চামড়ার একটা অদ্ভুত টুপী। গলায় কতকগুলি নানাকৃতি হাড়-গাঁথা মালা। বৎসর দুই বয়স হইবে। বাবাজী বলিল, দুই দিন হইল ছেলেটিকে সে কুড়াইয়া পাইয়াছে। কোনও পাহাড়িয়া রমণী ইহাকে হারাইয়া গিয়াছে, আজিও খুঁজিতে আসিল না। কেই বা ইহাকে খাওয়ায়, কেই বা কি করে।

কুমুদনাথ যদুবাবুকে বলিলেন—"চলুন একে আমরা নিয়ে যাই।"

"পাগল হয়েছেন? কি কর্‌বেন একে নিয়ে?"

"মানুষ কর্‌ব।"

"যদি এর মা এখানে খুঁজতে আসে?"

"বাবাজীকে ঠিকানা দিয়ে যাব; মার ছেলে মাকে ফিরিয়ে দেব।" বলিয়া কুমুদনাথ স্ত্রীকে নির্জ্জনে ডাকিলেন। তাঁহাকে বলিতে প্রথমে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। কুমুদনাথ অসহায় শিশুটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন—"দেখ, এরা অসভ্যজাতি, এদের কি ছেলে হারালে কোনও দুঃখ আছে? তা'হলে মা আসত, নিয়ে যেত। এখানে থাক্‌লে ছেলেটি দুই এক দিনে মারা পড়বে।"

এ কথায় গিরিবালার মাতৃহৃদয় বিচলিত হইল। তিনি শিশুটিকে লইতে সম্মত হইলেন। বোতলে খোকার জন্য দুগ্ধ ছিল, তাহার কিয়দংশ তাহাকে পান করান হইল।

নামিবার সময় উপস্থিত। ৪টা বাজিতে বেশী বিলম্ব নাই। ৫টার সময় সূর্য্যাস্ত হইবে। খোকা স্বীয় পিতৃক্রোড় দখল করিল

—তাহার চাকরের কোলে বন্য-শিশুকে দেওয়া হইল। রাত্রি ৭টার সময় ইহাঁরা দলবলে সিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন গিরিবালা বন্য-শিশুকে উষ্ণ জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, গলার মালা খুলিয়া, ফ্ল্যানেলে মুড়িয়া, কাজল পরাইয়া, মানুষের মত করিয়া তুলিলেন। কুমুদনাথ বলিলেন, ইহার নাম রহিল "বুনো"।

খোকা এইবার তাহার সহিত ভাব করিল। এতক্ষণ তাহার কিম্ভূত কিমাকার বেশ দেখিয়া ভয়ে তাহার কাছে ঘেঁসে নাই।

সন্ধ্যাবেলায় যদুবাবুর নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে বৃথা আস্ফালন করা তাঁহার অভ্যাস নহে। আহারান্তে বলিলেন—"কোথেকে একটা ছেলে কুড়িয়ে আনলেন, একদিন এর ফলভোগ করতে হবে।" কুমুদনাথ হাসিলেন। বলিলেন—"মশায় এ ত আর বাঘের শিশু নয়, যে বড় হয়েও জাতিধর্ম্ম ভুল্‌বে না, একদিন ঘাড় শুষে রক্ত খাবে!"

যদুবাবুর কোন উত্তর যোগাইল না। একটু থম্‌কিয়া গিয়া এক মিনিট্ পরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তা ঠিক, তা ঠিক। তা দেখুন মানুষ করে, এ বুনো পোষ মানে কি?"

বন্য-শিশু সারাদিন বেশ খেলা ধূলা করিল; কিন্তু পর দিন প্রভাতে দেখা গেল, তাহার গা ভারি গরম হইয়াছে—জ্বর হইয়াছে।

সারাদিন ছেলেটা জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল।

বৈকালে কুমুদনাথ ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার বলিল, ঠাণ্ডা লাগিয়া ফুসফুসে বিকৃতি ঘটিয়াছে। ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা হইল। রীতিমত চিকিৎসায় দুই দিন কাটিল। কিন্তু শিশুটি কিছুতেই বাঁচিল না।

২৯শে ডিসেম্বর রাত্রি দুইটার সময় গিরিবালার কোলে তাহার মৃত্যু হইল।

গিরিবালা অনেক কাঁদিলেন। বলিতে লাগিলেন—"আহা কার বাছা! আমরা যদি না আনি ত ভালই করি। কেন এ কুবুদ্ধি হল! মিছিমিছি নিমিত্তের ভাগী হতে হল। এখন যদি তার মা আসে তবে কি হবে, কি জবাব দেব?"

সঙ্গীহারা হইয়া খোকা একটু বিমনা হইল। থাকে থাকে আর জিজ্ঞাসা করে—"বুনো কোথায় গেল?"

সারাটা দিন এই দম্পতির মনের অসুখে কাটিল।

রাত্রি প্রায় ৯টা; আহারাদির পর কুমুদ বাবু শয়ন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় নিম্নে ডাকপিয়নের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ভৃত্যকে পত্র দিয়া সে ফিরিয়া গেল, তাহার পদ শব্দও পাওয়া গেল। কুমুদনাথ প্রতিমুহূর্ত্তে পত্রহস্তে ভৃত্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সে আর আসে না। নাম করিয়া ডাকিবার জন্য জানালা খুলিলেন। অত্যন্ত শীতল বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট কোলাহল ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কুমুদনাথ লণ্ঠন লইয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া গেলেন। দেখিলেন চাকর বিশুয়া একটা সুন্দরী যুবতী পাহাড়িয়া স্ত্রীলোককে ধরিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটা অত্যন্ত বল প্রয়োগ করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা

করিতেছে। কুমুদনাথকে দেখিবামাত্র সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে কুর্কি ছুরী বাহির করিল। তাহা দেখিয়া কুমুদনাথ পিছু সরিয়া আসিলেন, বিশুয়াও তাহাকে ত্যাগ করিল। তখন সে উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

বিশুয়া মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"বাবু—চোর।"

কুমুদবাবু তাহার বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিয়া বলিলেন,—"ধরিলি ধরিলি, হাত দুটা যদি ধরিতিস্, তবে ছুরী বাহির করিতে পারিত না।"

বিশুয়া বলিল, উহাদের গায়ে ভারি জোর; জাপ্টাইয়া না ধরিলে রাখা যাইত না।

যাহা হউক, কুমুদনাথ বিবেচনা করিলেন, চোর চুরি করিতে পারে নাই, পালাইয়াছে মাত্র, ইহাই ভাল। ধরিলে পুলিসে দিতে হইত এবং সেই সূত্রে অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হইত। ফিরিয়া উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। গিরিবালা সব শুনিয়া বলিলেন—"চোর নয়, তোমার চাকরের সখী। ধরা পড়বার ভয়ে উপস্থিত বুদ্ধির ব্যবহার করেছে।"

"তবে ছুরী কেন?"

"জাননা বুঝি? ও পাহাড়ী মেয়েদের দস্তুর। সঙ্গে সর্ব্বদা ছুরী থাকে।"

পরদিন প্রভাতে কুমুদবাবু চাকরটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সে রমণীকে স্বীয় প্রণয়িনী বলিয়া স্বীকার করিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। খোকাকে ঠেলাগাড়ীতে বসাইয়া তাহার চাকর তাহাকে বেড়াইতে লইয়া গেল। তখন বেলা দুইটা। গিরিবালা চাকরকে বারংবার করিয়া বলিয়া দিলেন যেন এক ঘণ্টার বেশী বিলম্ব না হয়।

তিনটা বাজিল, তবু খোকা ফিরিল না। সাড়ে তিনটার সময় স্বামী স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। খোকার অন্বেষণে চাকর পাঠাইবার পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় পুলিশ আফিস হইতে পত্র আসিল, বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে দারোগা কুমুদবাবুকে এখনি থানায় আহ্বান করিতেছেন।

একে ছেলে ফিরিল না; তাহার উপর পুলিশ হইতে এই পত্র; একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে দুই জনেই মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

কুমুদবাবু তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন। গিরিবালা শূন্যগৃহে শরবিদ্ধ হরিণীর মত ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইলে পর, গিরিবালা ভৃত্য বিশুয়াকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন বাবুর যদি আসিবার বিলম্ব হয়, তুই যত শীঘ্র পারিস সংবাদ আনিবি কি হইয়াছে।

কুমুদবাবু থানায় গিয়া দেখিলেন, অত্যন্ত জনতা। বারান্দায় ঠেলা গাড়ীতে খোকা ক্রন্দন করিতেছে; একজন কনষ্টেবল প্রহরায় নিযুক্ত। কুমুদবাবু গিয়া খোকাকে কোলে করিলেন। তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা তখন আশ্বস্ত হইল, চুপ করিল।

দারোগা সেলাম করিয়া বলিল,—"বাবু আজ আপনার সর্ব্ব-নাশ হইয়াছিল আর একটু হইলে। একটা লেপচা স্ত্রীলোক এই শিশুকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আপনার ভৃত্য বাধা দিতে, তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে।"

"চাকর কোথা ?"

"তাহাকে রিপন হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছি।"

"বাঁচিবে ত ?"

"শঙ্কা নাই, বাঁচিবে। ছেলেকেও খুন করিত, কিন্তু খোদা-বক্স সিপাহী গিয়া তাহাকে ধৃত করে।"

কুমুদবাবু অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, কল্য রাত্রির সেই পাহাড়িয়া রমণী নহে ত? দারোগাকে বলিলেন—"বন্দিনী কোথায় ?"

দারোগা কুমুদবাবুকে গারদ ঘরে লইয়া গেল। কুমুদনাথ দেখিলেন, সেই বটে ; সেই পাহাড়িয়া সুন্দরী। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার মনের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। সে কেন তাঁহার প্রতি এমন শত্রুতাপন্ন ?

দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কেন অমার ছেলেকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিছু জানেন ? কিছু স্বীকার করিয়াছে ?"

দারোগা বলিল—"ও বলে, তারাদেবী পাহাড়ে ওর ছেলে হারাইয়া গিয়াছিল, আপনি আনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া-ছেন তাই ও প্রতিশোধ লইতে চাহে।"

কুমুদবাবু বলিলেন—"আমি মারিয়া ফেলিয়াছি !—আমি—"

দারোগা বলিলেন—"সে আমি আপনার ভৃত্যের এজেহারে

সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। দেখুন বাবু, ইহারা ভয়ানক জাতি, ইহারা কি বুঝিবে যে আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া, উহার শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্যই লইয়া আসিয়াছিলেন? উহাদের বিশ্বাস, আপনি মারিয়া ফেলিবার জন্যই আনিয়াছিলেন এবং মারিয়াই ফেলিয়াছেন।”

কুমুদনাথ পূর্ব্বেই বিশুয়ার কোলে খোকাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার নিজ এজেহার দিয়া, একটা কুলি ডাকিয়া খোকার ঠেলাগাড়ী সহ বাড়ী ফিরিলেন।

গিরিবালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“আমার বাছার পুনর্জ্জন্ম হল আজ। কি কুক্ষণেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। চল, ফিরে চল দেশে, এখানে আর একদণ্ড আমার থাকতে ইচ্ছে নেই।”

পর দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। বৃষ্টিপাতের পর তুষারপাত আরম্ভ হইল। খোকার যে আমোদ! জানালা দিয়া হাত বাহির করিয়া তুষার স্পর্শ করিতে চায়।

ভারি অন্ধকার। চারিটা বাজিতে না বাজিতে ঘরে আলো জ্বালিতে হইল। কুমুদ বাবু বলিলেন, আজ সকাল সকাল আহার করিয়া লওয়া যাউক।

খোকা সারাদিন খেলা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছয়টার সময় কুমুদনাথ আহারে বসিলেন। গিরিবালা তাঁহার কাছে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

আহার শেষ হইলে কুমুদনাথ ঘেরা বারান্দায় বাহির হইলেন। দেখিলেন বিদ্যুতের মত একটা স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া দ্রুত ছুটিয়া গেল।

সে আর কেহ নয়; সেই সর্ব্বনাশী লেপচা-রমণী; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রক্ষীকে হত্যা করিয়া গারদ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনাবশতঃ, কুমুদনাথ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন; নিম্নে অবতরণ করিবামাত্র দেখিলেন, বিশুয়া চাকরের গলদেশ ছিন্ন, রক্তে ঘর প্লাবিত। দেখিয়া কুমুদনাথের গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। বুদ্ধি লোপ হইল। মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন।

শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গিরিবালা মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া ক্রন্দন করিতেছেন; সেই রাক্ষসী খোকাকেও হত্যা করিয়া গিয়াছে।

বাহিরে শীতের সন্ধ্যা অবিরাম অন্ধকার ও তুষার বর্ষণ করিতে লাগিল।

কাশীবাসিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দানাপুর ষ্টেশন হইতে দানাপুর সহর পাঁচ মাইল দূরে; ষ্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার নাম খগোল।

খগোলের বাজার হইতে কিয়দ্দূরে ষ্টেশনের মালগুদামের ছোট বাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসা বাড়ী। মৃণ্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে তিনটী সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দা মত। তার পরই অন্তঃপুর। দুখানি শয়ন ঘর, একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই);—উঠানটি টালি বিছান; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসা যুক্ত কূপ; মাসিক ভাড়া ৩।৷৹ টাকা।

গিরীন্দ্র চাকরিতে প্রবেশ করিয়া সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্যপানাদি যথেচ্ছাচারে কাটাইয়া সম্প্রতি বৎসর দুই কিঞ্চিৎ ভদ্র হইয়াছে—অর্থাৎ বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রীটি একটু বড় সড়;—বড় সড় দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। নাম মালতী। মুখখানি বেশ লালিত্য-মাখা। রংটি তত ফর্সা নহে। এই বয়সেই বেচারি বিদেশে একাকী স্বামীঘর করিতে আসিয়াছে। শাশুড়ী নাই—ননদ নাই,—দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই। স্বামী আপিস চলিয়া গেলে এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে বসিয়া মালতী দুই দণ্ড গল্প

করে। সম্বলের মধ্যে এক বুড়ী দাই ভজুয়ার মা। দিনরাত্রি বাড়ীতে থাকিয়া বধূকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে,—এই জন্য বেতন ১৲ বেশী। খগোলে অনেক দিন স্থায়ী একটি বাঙ্গালী পরিবার এই দাইটীকে পুরাতন ও বিশ্বাসী বলিয়া সুপারিশ করিয়া দিয়াছেন। সে যে পুরাতন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার মস্তকের শুভ্র কেশ, দেহের স্থৌল্য, চর্ম্মের লোলতা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। এবং বোধ হয় বিশ্বাসীও বটে—কারণ বাজার করিতে যাইতে তাহার অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখা যায়। গিরীন্দ্র বেচারী অত্যন্ত ভাল মানুষ; নিজেই হাটবাজার করিয়া কুলির মাথায় দিয়া লইয়া আসে। ভজুয়ার মা ততক্ষণ বারান্দার কোণে শুইয়া নিদ্রা উপভোগ করে।

শীতকাল, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বেলা নাই। মালতী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। যথাস্থানে চট বিছাইয়া কালো কম্বল মুড়ি দিয়া ভজুয়ার মা নাসিকাধ্বনিপূর্ব্বক মালতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। মালতী তাহার পানে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—আঃ, হতভাগী কি ঘুমের বোঝা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিস্।

এমন সময় বাহিরে একটা পরুষকণ্ঠ 'বাবু' 'বাবু' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মালতী ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গেল। অজস্র ছিদ্রসঙ্কুল দরজাটি বন্ধ,—একটি ছিদ্রে চক্ষু লগ্ন করিয়া দেখিল, একজন রেলওয়ে কুলি, মাথায় একটা তোরঙ্গ হাতে একটা পুঁটুলি,—দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে,—তাহার পশ্চাতে একজন বিধবাবেশিনী প্রৌঢ়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক।

চকিতের মধ্যে মালতী ফিরিয়া দাইকে ডাকাডাকি আরম্ভ

করিল। কিছুতেই দাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় না দেখিয়া সে অবশেষে তাহার গায়ে হাত দিয়া—"আগে ভজুয়াকে মা—য়ি" বলিয়া খুব জোরে নাড়া দিতে লাগিল। দাই তখন উঠিল—শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

এক মিনিট পরে স্ত্রীলোকটী আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। মালতীর মুখপানে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মালতী ভাবিল, স্বামীর কোনও আত্মীয়া হইবেন—কিন্তু কাহারও ত আসিবার কথা ছিল না; প্রণাম করিবে কি না ভাবিতে লাগিল।

নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই কি গিরীন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

মালতী বলিল,—"হাঁ"।

"তুমি তাঁর বউ?"

মালতী অন্যদিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল যে তাহাই। তাহার পর সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে যে চিনতে পারলাম না,—কোথা থেকে আসছেন?"

"আমি আসছি কাশী থেকে। গাড়িতে যাচ্ছিলাম, টিকিট হারিয়ে গিয়েছিল তাই নামিয়ে দিলে। শুনলাম আবার সেই রাত একটায় গাড়ী। একলা মেয়ে মানুষ কোথায় যাই,—তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ী খুঁজে এলাম।"

মালতী বলিল—"তা বেশ করেছেন। হাত পা ধুয়ে ফেলুন।"

দাই জল দিল। তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। মালতী ততক্ষণ একটি শতরঞ্চ আনিয়া বারান্দায় বিছাইল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"কখন গাড়ীতে উঠেছিলেন? খাওয়া দাওয়া হয়নি বোধ হয়?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কৈ আর হয়েছে।"

মালতী দাইকে বলিল—"শীঘ্র করে উনানটী জ্বেলে দে। দিয়ে বাজার যা, আলোচাল কিনে নিয়ে আয়।"

ইহা শুনিয়া নবাগতা সুমিষ্টস্বরে বলিলেন—"না মা আলো-চাল কিনতে দিতে হবে না। আলোচাল আমার পুঁটুলিতে বাঁধা আছে তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। মালতীকেও কাছে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি বাছা?"

"আমার নাম মালতী।"

"বাপের বাড়ী?"

"উত্তরপাড়া।"

"তোমার মা, বাপ সবাই আছেন?"

মালতী মুখখানি অন্ধকার করিয়া বলিল—"বাবা ত মারা গেছেন আমি যখন আঁতুড়ে,—মা মারা গেছেন যখন আমি এক বছরের।"

বলিয়া মালতী উঠিয়া গেল,—উনান জ্বালিতে দেরী হইতেছে বলিয়া দাইকে বকিল, নিজে উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

কাশীবাসিনী উঠিয়া রান্নাঘরে আসিলেন। মালতী ধৌত বস্ত্র পরিয়া রান্না চড়াইল। সেইখানে বসিয়াই আবার গল্প আরম্ভ হইল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কদ্দিন তোমার বিয়ে হয়েছে?"

"এই বোশেখ মাসে।"

"তবে ত অল্প দিনই হল। এখানে এসেছ কি মাসে?"

"এই দুমাস!"

"তোমার স্বামী কখন আপিসে যান?"

স্বামীর প্রসঙ্গে মালতীর লজ্জা হইল। মুখখানি নত করিয়া শতরঞ্জ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"নটার সময়।"

"কখন আসেন?"

"কোনও দিন ছটার সময় আসেন কোনও দিন সাতটা বেজে যায়।"

"কত মাইনে পান?"

"ত্রিশ টাকা।"

"তা ছাড়া উপরি আছে?"

মালতা লজ্জিত হইয়া বলিল—"কি জানি।"

কাশীবাসিনী একটু খুসী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল। মালতী জিজ্ঞাসা করিল—"আজ ভারি সকাল সকাল যে?" গিরীন্দ্র একটু হাসিল। বলিল—"তুমি একলাটি থাক, তাই এলাম আজ সকাল সকাল।"

মালতী বলিল—"আজ আমি ত একলা নই। আজ বাড়ীতে কে এসেছে বল দেখি?"

গিরীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল—"কে?"

"একটি বিধবা; তিনটের প্যাসেঞ্জারে কাশী থেকে দেশে যাচ্ছিলেন, টিকিট হারিয়ে যাওয়াতে নামিয়ে দিয়েছে।"

"কাশী থেকে ? সঙ্গে কেউ ছিল না ? বয়স কত ?"

"সঙ্গে কেউ ছিল না, বয়স ত্রিশ চল্লিশ।"

গিরীন্দ্র মালতীর অনুমান শুনিয়া হাসিল। বলিল—"ত্রিশ আর চল্লিশে কত তফাৎ তা তুমি ত্রিশ বচ্ছর বয়স না হলে বুঝতে পারবে না।"

এ কৌতুক ভাব বেশীক্ষণ রহিল না। গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল—"এত লোক থাকতে আমাদের বাড়ীই কেন এল ?"

মালতী একটু থমকিয়া গেল। স্বামী বিরক্ত হইবেন—তাহা ত সে একবারও ভাবে নাই, সে ত খুব আমোদ করিয়াই সংবাদটা দিতে অসিয়াছিল।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"দেখতে কেমন ?"

মালতী বলিল—"অত করে জেরা করছ কেন ?"

গিরীন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কাশী থেকে একলা মেয়ে মানুষ, কি রকম বিধবা তাই ভাবছি !"

মালতী বুঝিল। বলিল—"না না—যা ভাবছ তা নয়। ভাল লোক।"

গিরীন্দ্র বলিল—"ভারিত জান! যেমন তোমার বুদ্ধি! কখন যাবে বলেছে ?"

"তা ত কিছু বলেন নি।"

"রাত একটার সময় আবার গাড়ী।"

"অত রাত্তে কি করে একলা ষ্টেশনে যাবেন ? কে পৌঁছে দেবে ?"

গিরীন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আমি পৌঁছে দেব। এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল। আমি যাব—সঙ্গে করে পৌঁছে দেব।"

মালতী মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিল। গিরীন্দ্র বাহিরে গিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আসিল।

তখনও মালতী সেই রকম করিয়া বসিয়া আছে। গিরীন্দ্র বলিল—"ব্যাপারখানা কি ?"

মালতী বলিল—"বাড়ীতে মানুষ এসেছে তাড়িয়ে দেবে কি করে ? উনি নিজে থেকে কিছু বলেন নি, কি করে বলবে যে তুমি যাও রাত একটার গাড়িতে ?"

গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল—"ওগো সে জন্যে তোমার ভাবনায় দরকার কি ? সে ভার আমার।"

ইহার পর গিরীন্দ্র তোরঙ্গ খুলিয়া একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ পান করিল।

মদ্যের প্রভাবে তাহার মুখের বিরক্তি ভাব শীঘ্র অপনোদিত হইতে লাগিল। মালতীর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে গল্প আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, কাশীবাসিনী আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান হইলেন। গিরীন্দ্র হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বলিল—"আপনার আসাতে বড়ই আনন্দিত হলাম।" বলিয়া প্রণাম করিল।

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নিবাস ?"

"আপাততঃ কাশীবাস করছি বাবা।"

"কোথা যাওয়া হচ্ছিল ?"

"একবার দেশে যাব ভেবেছিলাম—তা টিকিট হারিয়ে গেল, —নামিয়ে দিলে। তাই মনে করলাম—"

গিরীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—"তা বেশ করেছেন, উত্তম করেছেন। আজ এখানে থাকুন, কাল বেলা তিনটের গাড়িতে যাবেন এখন।"

"আজ রাত একটার গাড়িতে—"

"পাগল! অত শীতে, বুড়ো মানুষ মারা পড়বেন যে! কিছু বিশেষ প্রয়োজন ত নেই!"

"তা নেই যদিচ।"

অতঃপর গিরীন্দ্র শাল গায়ে দিয়া ছড়ি লইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইল।

রাত্রি দশটার সময় ফিরিল। কাশীবাসিনী তখন শয়ন করিয়াছেন। দাই নিদ্রিত, মালতীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকা-ডাকিতে সেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিবা মাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মুখে মদের গন্ধ, কিন্তু মালতীর সহিয়া গিয়াছিল।

মালতী বলিল—"এত রাত!"

"একটা ভাল খবর আছে।"

"কি?"

"বদলি হল তাড়িঘাটে।"

"মাইনে বেড়েছে?"

"পাঁচ টাকা।"

"মোটে!"

এই কথা কহিতে কহিতে দুই জনে শয়ন গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। গিরীন্দ্র হাসিয়া বলিল—"তা দিক না দিক সেখানে দু পয়সা আছে।"

"কবে যেতে হবে ?"

"তিন চার দিন পরে।"

গিরীন্দ্র বলিল বাহিরে সে অনেক খাইয়া আসিয়াছে—আহার করিবে না। মালতী আহার করিয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী নিদ্রিত।

পর দিন প্রভাতে সাতটার সময় গিরীন্দ্র গাত্রোত্থান করিল। স্নানাদি করিতে আটটা বাজিল। কাশীবাসিনীকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাগী কাল যায় নি ?"

মালতী বলিল—"বেশ! নিজে কাল মানা করলে ওঁকে যেতে! উনি ত একটায় সময় যেতে চেয়েছিলেন!"

গিরীন্দ্র বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। বলিল আজ তিনটের প্যাসেঞ্জারের আগে কুলী পাঠিয়ে দেব। পাপ বিদেয় করে দিও। যাবার সময় সাবধানে থেক, কিছু নিয়েটিয়ে না যায়।"

মালতী ডাগর বিষণ্ণ চোখ দুটিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র আপিসে বাহির হইয়া গেলে মালতী কাশাবাসিনীকে বলিল, "আসুন আমরা স্নান করে ফেলি।"

স্নান করিতে করিতে দুইজনে অনেক গল্প হইল। বিদেশে আসিয়া অবধি মালতী একদিনও এমন করিয়া গল্প করিতে পায়

নাই। ভোজুয়ার মাতার সঙ্গে হিন্দী কহিয়া কহিয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্নানান্তে কাশীবাসিনী আহ্নিক করিতে বসিলেন। গঙ্গাজল নাই—কূপজলেই ইদং গঙ্গোদকং বলিয়া সারিতে হইল।

আহারান্তে উঠানে কূপের ধারে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ চুল শুকান এবং বিশ্রাম করা হইলে মালতী চুল বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিল। এতদিন সে নিজে নিজে চুল বাঁধিয়াছে। নিজে কি ভাল করিয়া চুল বাঁধা যায়? তাহার চুলের অবস্থা দেখিয়া কাশীবাসিনী অনেক দুঃখ করিলেন। একটি ঘণ্টা ধরিয়া, অতি পারিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন।

ক্রমে দুইটা বাজিল। এইবার কুলী আসিবে। কাশীবাসিনী প্রস্তুত হইলেন, বলিলেন—"মা, এক দিনেই তোমার উপর মায়া জন্মে গেছে। যেতে কষ্ট হচ্চে।"

মালতীরও সেইরূপ বোধ হইতেছিল। বিদেশে কতদিন পরে এক জন রমণীর স্নেহ-ব্যবহার পাইয়া তার যেন পরমাত্মীয় লাভ হইয়াছে মনে হইতেছিল। ইনি চলিয়া গেলে আবার সেই সারাদিন ধরিয়া একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহারও বড় কষ্ট হইতে লাগিল।

মালতী বলিল—"আজ নেই বা গেলেন! দুদিন থাকুন না। এ দুদিন আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বেঁচেছি। একলাটি প্রাণ হাঁফিয়ে উঠে। এক এক সময় কান্না পায়।"

কাশীবাসিনী বলিলেন—"আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু বাছা তোমার বর কিছু ভাবেন যদি?"

মালতী মুখে বলিল—"ভাববেন আবার কি?"—কিন্তু মনটি

তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সত্যই ত, স্বামী যে ইহাঁর উপর প্রসন্ন নহেন। কুলীটা আসিলে অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বামী পাছে বেশী রাগ করেন?

তাহার পর ভাবিল—তা করেন, করিবেন। এমন ত আর কিছু গর্হিত কার্য্য করা যাইতেছে না। আমি এই একলাটি এই সংসার ঘাড়ে করিয়া মরিতেছি, কেহ আহা বলিবার নাই, কথা কহিবার একটা মানুষ নাই—আমি একজন লোককে দুই দিন রাখিতে পারি না! স্বামী আসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে মালতী কি কি বলিবে, কি রকম করিয়া রাগ করিবে, সব মনে মনে গড়িয়া রাখিতে লাগিল।

দুইটা বাজিল, কুলী আসিল না। তিনটা বাজিয়া গেল, তথাপি কুলীর দেখা নাই। মালতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—তখন আবার মনের সুখে কাশীবাসিনীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

বৈকালে মালতী জলখাবার কিনিতে দাইকে বাজারে পাঠাইতেছিল, কাশীবাসিনী বলিলেন,—"ছাইপাঁশ বাজারের জলখাবার গুলো কেন খাও তোমরা? ঘরে খাবার তৈরি করতে জান না?"

মালতী বলিল—"কে অত হাঙ্গামা করে বাবু!"

"হাঙ্গামা আবার কি? আমি তোমায় আজ দেখিয়ে দিচ্চি।" বলিয়া তিনি দাইকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিজের বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুজি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি কিছু কিছু আনিবার আদেশ করিলেন।

মালতী বলিল—"ও কি কথা! আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন? আমি টাকা দিই।" বলিয়া দাইকে বলিল—"টাকা ফিরিয়ে দে

দাই।” দাই টাকাটি কাশীবাসিনীর হাতে দিতে গেল,—তিনি কিছুতেই লইবেন না। বলিলেন—“আমি তোমাদের জন্যে একটা টাকা খরচ করলামই বা; তোমরা আমায় কত যত্ন কত আদর করছ।—”

মালতী বলিল—“ভারি আদর ভারি যত্ন করেছি আপনাকে কি না! আদর যত্ন করতে আমি জানি কি না! নিন্ টাকাটা রাখুন।”

তিনি বলিলেন—“দেখ বাছা, তা হলে কিন্তু আজই রাত্তির একটার গাড়ীতে চলে যাব।”

তখন মালতী ক্ষান্ত হইল। বলিল—“কর বাছা তোমার যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু অন্যায় হল বলে রাখছি।”

দাই টাকা লইয়া বাজারে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল অনেক বিলম্বে; রাত্রি প্রায় তখন আটটা। আসিয়া কাশীবাসিনীকে দেখিয়াই বলিল—“আমার বড় অপরাধ হয়ে গিয়েছে। আপিসে কাযের ভিড়ে আপনাকে নিতে কুলী পাঠাতে একেবারেই মনে ছিল না। দু দিন যখন কষ্ট পেলেন, আর একটা দিন তখন কষ্ট করুন। কাল আর আমার আপিস নেই, কাল নিজে গিয়ে আমি আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসব।”

মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে মালতী মদ্যগন্ধ পাইল। বলিল

—"তোমার গতিক ভাল নয়। সেখানে গেলে, হাতে বেশী পয়সা পেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে।"

গিরীন্দ্র বলিল—"আরে রামঃ, সে ছোট ষ্টেশন, রজ পাড়াগাঁ, সেখানে কি কেলনার কোম্পানি আছে? সেখানে গিয়ে, গঙ্গা-স্নান করে, সব ছেড়ে দেব বস্ একদম।"

"তুমি কাল আপিসে যাবে না?"

"না, আমার এখানকার কায শেষ হয়ে গেছে। বাবুরা ধরেছে পরশু ভোজ দিতে হবে। কাল সব যোগাড় যন্ত্র করে রাখতে হবে।"

গিরীন্দ্র হস্তপদাদি ধৌত করিয়া অসিয়া বলিল—"আজ আর জল খাবার খাব না, কোথাও বেরুব না;—রুটি দাও একবারে খাই।"

মালতী লুচী, মোহনভোগ, মাছের তরকারী প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ যাহা কাশীবাসিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সমস্ত আনিয়া দিল। গিরীন্দ্র আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। বলিল—"দেখ উনি মাংস রাঁধতে জানেন কি না জিজ্ঞাসা কর দিকিন।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল—"জানেন কিছু কিছু।"

"দেখ আমি একটা কথা ভাবছি। ওঁকে যদি দুই এক দিন থাকতে বলা যায়, উনি থাকেন না? তা হলে পরশু ভোজ পর্য্যন্ত ওঁকে রাখা যাক। একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

মালতী মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল,—"তুমি জিজ্ঞাসা কর না।"

গিরীন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিল--"এ অবস্থায় কি ওঁর সঙ্গে কথা কইতে পারি ?"

মালতী বলিল—"আহা মরে যাই! আজ বাড়ী এসেই ওঁর সঙ্গে কথা কইলে না?" বলিয়া কাশীবাসিনীর কাছে গিয়া প্রস্তাবটা করিল। তিনি সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গিরীন্দ্র ভোজের জিনিসের ফর্দ্দ করিল। কাশীবাসিনী তাহা শুনিয়া যে সকল মন্তব্য ও পরিবর্ত্তনাদি প্রস্তাব করিলেন, তাহা গিরীন্দ্রের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। আড়ালে মালতীকে বলিল—"দেখ ইনি একজন ওস্তাদ লোক! কাশীতে শুধু ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে করো না।"

মালতী রাগ করিয়া বলিল—"কি বল যাও! তোমার মন ভারি অশুদ্ধ!"

দুই ক্রোশ দূরে গুরগাঁও নামক পল্লীতে দেবী আছেন। পরদিন প্রভাতে সেই খানে ছাগবলি পাঠান হইল।

রাত্রিকালে ভোজের ব্যাপার—নির্ব্বিঘ্নে বলিতে পারি না—সম্পন্ন হইয়া গেল। রন্ধনাদি চমৎকার হইয়াছিল—যদি ভোক্তারা সকলে সচেতন থাকিত—তবে সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে পারিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার। আজ রাত্রের গাড়ীতে গিরীন্দ্র তাড়িঘাট যাত্রা করিবে। কাশীবাসিনী বলিলেন—"আমি আর দেশে যাব না—আমিও কাশীতেই ফিরে যাই।"

মালতী বলিল—"বেশ ত আপনিও আমাদের সঙ্গেই চলুন। তাড়িঘাট থেকে চার পাঁচটা ষ্টেশন বৈ ত নয়।"

আহারান্তে গিরীন্দ্র মালতীকে বলিল—"গোটা ত্রিশ টাকা বের করে দাও ত—বাজার দেনা গুলো মিটিয়ে আসি।"

মালতী বলিল—"অবাক কথা! আমার কাছে আর টাকা আছে না কি?"

"কেন সে দিন যে আশি টাকা এনে দিলাম!"

"পরশু বাজারে যাবার সময় ত্রিশ নিয়ে গেলে, বাকী যা ছিল কাল সন্ধেবেলা সে সবই ত প্রায় দিলাম তিন চার বারে। আর টাকা কোথায়?"—বলিয়া মালতী বাক্স খুলিয়া দেখিল, দুই টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র রহিয়াছে।

গিরীন্দ্র বলিল—"এখন উপায়? আমার কাছেও ত কিছু নেই?"

মালতী চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল—"আমি কি করব? মদেই তোমার সর্ব্বনাশ করলে। সে সময় ত জ্ঞান থাকে না, তখন কেবল দাও টাকা দাও টাকা বল।"

গিরীন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"দেখি, কারু কাছ থেকে ধার নিই গে।"

কাশীবাসিনী বাহিরে বসিয়া সব কথা শুনিয়াছিলেন।

মালতীকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওঁকে বারণ কর মা, আমার কাছে টাকা রয়েছে, আমার ত এখন দেশে যাওয়া হল না।"

মালতী গিয়া স্বামীকে বলিল। গিরীন্দ্র বলিল—"সে কি কাযের কথা? ওঁর কাছে টাকা নেব, আলাপ নেই, পরিচয় নেই!"

কাশীবাসিনী এ কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—"তাতে আর ক্ষতি কি বাবা? তোমরা তাড়িঘাটে গিয়ে থিতু হয়ে বস; আমি কিছুদিন পরে আবার আসব এখন তোমাদের কাছে; দেখা শুনোও হবে, টাকাও নিয়ে যাব।"

গিরীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল—"তা হলে আপনি অনুগ্রহ করে কাশী না গিয়ে আপাততঃ তাড়িঘাটে চলুন আমাদের সঙ্গে। পাঁচ ছ দিনেই আপনার টাকা কটি ফিরে দিতে পারব।"

"আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। কত চাই? তিরিশ? যদি বেশী দরকার থাকে তাও আমার কাছে আছে। যা লাগে বল বাবা।"

গিরীন্দ্র বলিল—"না মা বেশী চাইনে, ত্রিশ দিলেই হবে।"

কাশীবাসিনী বাক্স খুলিয়া দশ টাকার তিন খানি নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সেই দিন রাত্রি এগারোটার গাড়ীতে গিরীন্দ্রনাথ স্ত্রী ও কাশীবাসিনীকে লইয়া যাত্রা করিল। ভোজুয়ার মা কাঁদিতে লাগিল। গিরীন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু সে স্বীকার পাইল না।

ষ্টেশনের পথে কাশীবাসিনী মালতীকে বলিলেন—"বাছা,

বাবাকে বল যেন আমার কাশীর টিকিট করেন। আমার বিশেষ দরকার আছে।”

গিরীন্দ্র ইহাঁকে তাড়িঘাটে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর জিদ করিল, কিন্তু ফল হইল না।

তাড়িঘাটে যাইতে দিলদারনগরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। গিরীন্দ্র ভোর রাত্রে স্ত্রীকে লইয়া দিলদারনগরে নামিয়া গেল;—কাশীবাসিনী কাশী চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেলা সাতটার সময় গিরীন্দ্রনাথ নূতন কর্ম্মস্থান তাড়িঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। সরকারি বাসা নির্দ্দিষ্ট আছে সেইখানে গিয়া উঠিল। জিনিষপত্রগুলা কতক গুছাইয়া ষ্টেশনে বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

মালতী স্নান করিবে বলিয়া কাপড় বাহির করিবার জন্য একটা তোরঙ্গ খুলিল। সচরাচর তাহার গহনার বাক্সটি এই তোরঙ্গের মধ্যেই থাকিত। কাপড় বাহির করিতে গিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, গহনার বাক্‌স নাই।

তখন মালতী ভাবিল, নিশ্চয়ই অন্য কোন বাক্সে আছে। যতগুলি বাক্স আছে, একে একে সমস্ত খুলিয়া খুঁজিল, কোথাও নাই।

মন বোঝে না, দুইবার—তিনবার করিয়া প্রত্যেক বাক্সটির প্রত্যেক জিনিষ আলাদা আলাদা করিয়া খুঁজিল, তথাপি পাইল না। তখন সে হতাশ হইয়া ধূলায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ঘণ্টা খানেক ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিল। ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়ে চম্পকলতা তার ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া বউ দেখিতে আসিয়াছিল, সে মালতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চম্পট দিল।

শেষে গিরীন্দ্র আসিল। সে দেখিয়া বলিল—"এ কি!"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিল।

শুনিয়া গিরীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল—"বেশ করে সব খুঁজেছ?"

"কিছু বাকী রাখিনি।"

"শেষ তাকে কখন দেখেছ?"

"কাল খগোলে গুছিয়ে একখানি শালুর টুকরোতে বেঁধে ঐ কালো তোরঙ্গের মধ্যে রেখেছি বেশ মনে পড়ছে।"

"গাড়ীতে কালো তোরঙ্গ খুলেছিলে? কিছু জিনিষপত্তর বের করতে?"

"খুলেছিলাম একবার। শীত করতে লাগল, শালটা বের করেছিলাম।"

"সে সময় গহনার বাক্স বের করে ফেলে রাখনি ত?"

মালতী বলিল—"কখ্খনো না। উপরে শাল খানা ছিল—শুধু ভয়ে ভয়ে শাল তুলে নিয়েছি।"

"চাবি কোথা রেখেছিলে?"

"কোমরে ছিল।"

"তারপর ঘুমিয়েছিলে?"

"তা ঘুমোলাম বৈকি।"

গিরীন্দ্র নিশ্চিত স্বরে বলিল—"তবে কাশীর সেই মাগী নিয়েছে।"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র বলিতে লাগিল—"যখন ঘুমিয়েছিলে, তখন আস্তে আস্তে কোমর থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে গহনার বাক্সটি বের করে নিয়েছে।- তার নাম কি জান?"

"না। বুড়ো মাগীর নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কখনও?"

"কাশীতে কোথায় থাকে জান?"

"কি একটা মঠে।"

গিরীন্দ্র রাগিয়া বলিল—"কাশীতে ত দুশো ছাপ্পান্নটা মঠ আছে,—কোন মঠে—কোনখানে সে মঠ কিছু শুনেছ?"

"না।"

"সেই কালেই বলেছিলাম, ও সব লোককে বিশ্বাস কোরো না। ওরা সর্ব্বনেশে লোক—কাশীর বেশ্যা। ত্রিশ টাকার চার ফেলে যথা সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেল!"

মালতী বলিল—"তিনি কখ্‌খনো নেন নি। তিনি নেবেন কেন? আমিই বোধ হয় খগোলে ফেলে এসেছি।"

গিরীন্দ্র কিন্তু তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। বলিল—"ও সব কথা রেখে দাও,—জাননা ত পৃথিবীর গতিক! আচ্ছা সে মাগী কোনও দিন তোমার গহনা দেখতে চেয়েছিল?"

মালতী ভয়ে ভয়ে বলিল—"তা চেয়েছিলেন; সেই ভোজের দিন। বল্লেন—"মা তোমার কি কি গয়না আছে দেখি।"—আমি বের করে সব দেখালাম।"

গিরীন্দ্র বলিল—"তবে আর কোন সন্দেহ নেই। আমি

চল্লাম পুলিসে টেলিগ্রাপ করতে।" বলিয়া গিরীন্দ্র ষ্টেশনে গেল; মালতী আবার একা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহে এই দম্পতি গহনার শোক প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বমত হাসে, গল্প করে, আমোদ করে। নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি গিরীন্দ্র বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতেই বোধ হয় গহনা লোকসানের কষ্ট অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

যে দিন পুলিসে টেলিগ্রাফ্ করা হইয়াছিল, সেই দিনই দিল-দার নগর হইতে হেড কনষ্টেব্ল আসিয়া গহনাগুলির ফর্দ্দ ও বিবরণ গিরীন্দ্রনাথের জবানবন্দীসহ লিখিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে পুলিসের তরফ হইতে আর কোনও সংবাদ নাই।

বেলা সাড়ে এগারোটা; গিরীন্দ্রনাথ আপিসে গিয়াছে। মালতী খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় দিলদারনগর হইতে গাড়ী আসিল। গিরীন্দ্রনাথের বাসা প্ল্যাটফর্ম্মের নীচেই, দুয়ারে দাঁড়াইলে প্ল্যাটফর্ম্ম, গাড়ী, লোকজন সব দেখা যায়। যতবার গাড়ী আসিত, ততবার মালতী দেখিতে ছুটিত, প্রতি গাড়ীটি না দেখিলে যেন তাহার কর্ত্তব্যের হানি হইবে! গাড়ীর শব্দ শুনিবা-মাত্র মালতী থালা ফেলিয়া এঁটো হাতে এঁটো মুখে গাড়ী দেখিতে গেল। বদ্ধ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ফুটা দিয়া দেখিল, প্ল্যাট-

ফর্ম্মের উপর কাশীবাসিনী নামিয়াছেন, একটা কুলী তাঁহার জিনিষ নামাইতেছে; তিনি কুলীকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলীটা গিরীন্দ্রনাথের বাসার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

মালতী ছুটিয়া উঠানে গিয়া আচমন করিল। কম্পিত বক্ষে কাশীবাসিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিল। কত কি যে তাহার মনে হইল। কত আহ্লাদ হইল, আর কতবার মনে মনে বলিল, হে ঠাকুর, স্বামী যে তাঁহার প্রতি গহনাচুরির অপবাদ দিয়াছেন, তাহা যেন উহাঁর কর্ণগোচর না হয়। তিনি যে গহনা লন নাই, এই বিশ্বাস তাহার ছিল। আসিতে দেখিয়া এ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। নহিলে কখনও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হন!

কয়েক মিনিট পরে কাশীবাসিনী মালতীর নিকট পৌঁছিলেন। "মা এসেছেন?" বলিয়া মালতী প্রণাম করিল। তিনি মালতীকে মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মালতী বলিল—"আপনি স্নান করে ফেলুন—আমি ভাত চড়িয়ে দিই।"

"স্নান করেছি। ভাত চড়াতে হবেনা,—আজ একাদশী"।

মালতী লক্ষ্য করিল—কাশীবাসিনীর মুখখানি যেন বড় গম্ভীর,—বিষণ্ণ। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন ছল ছল করিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মনটা এত ভার ভার কেন?"

তিনি বলিলেন—"জান না?"

মালতী ভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

"তোমাদের সন্দেহ, আমি তোমার গহনার বাক্স নিয়ে গেছি, পুলিশ পাঠিয়েছ, জান না?"

মালতী লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমি যদি বলি, আমার মনে একদিনও এ সন্দেহ হয়নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি ?"

কাশীবাসিনী ম্লানমুখে বলিলেন—"তোমার স্বামীর ত বিশ্বাস হয়েছে বাছা।"

মালতী বলিল—"পুলিস আপনার সন্ধান পাবে, তা উনি ভাবেন নি। উনি ত আজও বলছিলেন, কাশীতে কত লক্ষ লক্ষ মঠ, কোটি কোটি সেবাধারী, কে কার সন্ধান পায়।"

"বের ত করেছিল আমায়। আমার উপর জুলুমটা করেছে কি কম ? দুটিশো টাকা নগদ ঘুস গুণে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পেয়েছি।"

মালতী বলিল—"আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার সাজা যা হবার তা হল।"

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"গিরীন্দ্র কথন আসবেন ?"

"সন্ধেবেলা।"

উঠানে রৌদ্র নিভিয়া গেল। মেঘ করিয়া উঠিল। কাশীবাসিনী বাহিরের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"জল ঝড় না হলে বাঁচি।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

"আজই যাব।"

"আজই যাবেন !"

কাশীবাসিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ভারি ছেলেমানুষ! তোমার স্বামী আমাকে চোর বলে সন্দেহ করেন, আর

তোমার ইচ্ছে যে আমি থাকি! আমি আড়াইটের গাড়ীতে ফিরব। আমাদের মঠের আরও অনেক লোক শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছে। কাল আমরা সবাই রওনা হব।”

মালতী জিজ্ঞাসা করিল—“কতদিনে ফিরবেন?”

“কেন? ফিরলে কি দেখা হবে?” বলিতে বলিতে কাশী-বাসিনীর চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—“একটি কায করবে?”

মালতী সাগ্রহে বলিল—“কি?”

“আমার কতকগুলি গয়না আছে, সে গুলি তুমি পর দিকিন।” বলিতে বলিতে কাশীবাসিনী তাঁহার সঙ্গের তোরঙ্গটি খুলিয়া একটি হাত বাক্স বাহির করিলেন। মালতী বিস্মিত হইয়া দেখিল তাহার ভিতর বিস্তর গহনা, ভাল ভাল জড়োয়া গহনা।

কাশীবাসিনী বলিলেন—“এইগুলি সব তুমি নাও।”

সোনা রূপা হীরা মোতি চুনীর চাকচিক্যে মালতীর চক্ষু ঝলসিত। তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—“সে আমি পারব না।”

“কেন?”

“আপনার এই রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব?”

“আমি দিচ্চি।”

“আপনি দিচ্চেন কিন্তু আমি কোন অধিকারে নেব? সে আমি পারব না।”

আকাশে মেঘ বাড়িয়া উঠিল। ঝড় উঠিল। দিবালোক অত্যন্ত কমিয়া গেল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"অধিকার যদি থাকে ?"

মালতী বলিল—"অধিকার ? কি অধিকার ?" কাশীবাসিনী মুখখানি নীচু করিয়া বলিলেন—"তা বলব, তা বলতেই আজ এসেছি।"

মালতীর বুক গুর গুর করিয়া উঠিল। অবাক হইয়া কাশী-বাসিনীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মা কি সত্যি মরেছে ?"

মালতী থতমত খাইয়া বলিল—"কেন ?"

"তাই জিজ্ঞাসা করি।"

"সবাই ত বলে।"

"তা হলে তুমি জান। আমিই তোমার পোড়ারমুখী মা।" বলিতেই কাশীবাসিনীর চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বহিল।

মালতী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। পরে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অল্প দিনের একটি ঘটনা ভাবিতে লাগিল। মোক্ষদা ঠান্‌দি তীর্থ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে রাত্রে শুইয়া শুইয়া তার জ্যেঠাইমার সঙ্গে অনেক কথা বলাবলি করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন মালতী ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মালতী ঘুমায় নাই, সব শুনিতে পাইয়াছে। যাহা শুনিল তাহাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যেন তার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। তাহার যে মাকে এতদিন স্বর্গগতা জানিত, শুনিল তিনি বাস্তবিক জীবিতা,ঠানদির তাঁহার সহিত কোন্ তীর্থে হঠাৎ দেখা হইয়াছে। জানিল যে মার স্মৃতি পুণ্যতম বলিয়া কন্যা আশৈশব পরম ভক্তিভরে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—সে মার স্মৃতি সংসারে ঘৃণিত, মা তার কলঙ্কিনী। সে রাত্রের কষ্ট তাহার অবর্ণনীয়।

এই সেই মা! আবার সে রাত্রের তীব্র অনুভূতি ফিরিয়া আসিল।

মালতী আবার শিহরিয়া উঠিল, অজ্ঞাতসারে একটু দূরে সরিয়া বসিল।

কাশীবাসিনী তখনও কাঁদিতেছিলেন। একটু আত্মস্থা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"জামাই জানেন?"

"না।"

"তুমি কতদিন হল শুনেছ?"

"বিয়ের পর।"

"মোক্ষদা পিসির কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"মোক্ষদা পিসির মুখেই শুনলাম তোমার বিয়ে হয়েছে, দানাপুরে মালঘরে জামাই কর্ম্ম করেন, পূজার সময় তুমি দানাপুরে আসবে তাও ঠিক হয়েছে।"

মালতী বলিল—"তা হলে তুমি হঠাৎ এসে পড়নি দানাপুরে, জেনে শুনে এসেছিলে? কেন?"

মালতীর স্বর এখন কঠোর।

কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আপনার সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পারে?"

মালতীর এবার একটু একটু কান্না আসিতে লাগিল। আপনার মা না জানিয়াও ইহাঁর প্রতি যে মাতৃবৎ আকর্ষণ হইয়াছিল, তাহাই মনে পড়িল। কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"কেন তুমি জানালে তুমি কে?"

"কি জানি। থাকতে পারলাম না।"

মালতী আবেগভরে একবার বলিতে যাইতেছিল—জানিয়েছ ভালই করেছ। নইলে কথনো ত মা চক্ষে দেখতে পেতাম না!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল—"এ মা! নাই দেখতাম!"

এই দ্বিধাভাবে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর সময় হইল। কাশীবাসিনী কুলীকে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে জিনিস লইতে আসিল।

মালতী বলিল—"গহনা নিয়ে যাও। এ আমি পরব না।"

কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন—"যা ভেবেছ তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি আজ চৌদ্দ বচ্ছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর এর একখানিও পাপের অর্জ্জন নয়। আমি মস্তবড় মানুষের মেয়ে ছিলাম—শোন নি?"

মালতী বলিল—"তবু আমার স্বামীকে সব না জানিয়ে তাঁর না নিয়ে আমি নিতে পারিনে।"

"তাই কোরো। তিনি যদি তোমায় পরতে না দেন, তবে দেব সেবায় দিও।"

তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন।

মালতী আর থাকিতে পারিল না।—"মা আবার দেখা দিও" বলিয়া, কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।

"সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও", বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কলির মেয়ে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৈত্রের দিবা অবসিত প্রায়। গোপাল সরকারের বৈঠক-খানায় বসিয়া বিজয় মিত্র পাশা খেলিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"বাবা, শিগ্‌গির বাড়ী এস, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া বৈঠকখানাসুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাম সর্ব্বদা আসে না,—যাহা আসে, তাহা প্রায়ই দুঃসংবাদ, বিপদের সংবাদ।

বিজয় মিত্র খেলা ফেলিয়া, ভিজা গামছায় কপালের ঘাম মুছিয়া, চটীজুতা পায়ে দিয়া, ত্বরিত পদে বাড়ী আসিলেন। দূর ষ্টেশন হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর টেলিগ্রাফ চাপরাসি আসিয়াছে, সদর দরজার বারান্দায়, বৃহৎ লাঠি লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। অসংখ্য কুতূহলী বালকবালিকা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া।

বিজয় মিত্র রসিদে নাম সহি করিয়া দিয়া, কম্পিত হস্তে টেলিগ্রাম খুলিলেন। পাঠমাত্র তাঁহার মুখে আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। বলিলেন—"ভাল খবর।"

"কি ?"

"বিনু বাড়ী আসছে।"

"বিনু ? কোথা থেকে ? কবে আসবে ?"

"তা লেখেনি। মোকামা থেকে তার করেছে, কাল এসে পৌঁছবে বোধ করি।"

বিজয়হরি ও বিনোদবিহারী দুই ভাই—সহোদর। বিনোদ যখন ছোট, তখন ইহারা পিতৃমাতৃহীন হয়। বিজয়হরির স্ত্রীই বিনোদকে মানুষ করিয়াছিলেন।

বিনোদ বড় হইলে সে ভারি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। এই সূত্রে দাদার সঙ্গে প্রায়ই তাহার বচসা হইত। এক দিন ক্রোধান্ধ হইয়া বিজয়হরি বিনোদকে জুতার দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। সেই দিন বিনোদ পলায়ন করিল। একদিন দুইদিন করিয়া এক সপ্তাহ গেল, বিনোদ ফিরিল না। তখন বিজয়হরি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলেন। দশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন,—তথাপি বিনোদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে মাস কাটিল, বৎসর কাটিল, এইরূপে তিনটি বৎসর কাটিয়াছে। বিনোদ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আত্মীয় বন্ধু সমাজে বিজয়হরি লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারেন না,—আজ সহসা সংবাদ আসিল সেই ভাই বাড়ী আসিতেছে।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা উঠানের তুলসী গাছ সওয়া পাঁচ আনার হরিলুট পাইয়া গেল। গ্রামময় এ সংবাদ রটিত হইল। বন্ধুবান্ধব উৎসুকচিত্তে বিনোদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পর দিন অপরাহ্নকালে বিনোদের গাড়ী গ্রামে প্রবেশ করিল। বিনোদ গাড়ী হইতে নামিল। হাতে একটি সবুজ বনাতের

ঘেরাটোপযুক্ত ক্যাশবাক্স। গাড়োয়ান এবং বাটীর ভৃত্য মিলিয়া জিনিষপত্র নামাইল।

বিনোদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাদা ও বউদিদিকে প্রণাম করিল। ছেলেপিলেকে কোলে করিয়া, আদর করিয়া অনর্থ করিল। বউদিদিকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া, ক্যাশবাক্সটি তাঁহার হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল—"এটি খুব সাবধানে তোমার আয়রণচেষ্টে রেখে দাও বউদিদি।"

বউদিদি দেখিলেন বাক্সটি বিলক্ষণ ভারি।—খুসী হইয়া সিন্দুকে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন—

"এত দিন কোথা ছিলে ঠাকুরপো?"

"ছিলাম মোতিহারিতে।"

"এত দিনে মনে পড়ল?"

"চাকরি ফেলে কি করে আসি বউদিদি?"

"কত টাকা মাইনে হয়েছে?"

"একশো কুড়ী টাকা।"

"বিয়ে করেছ?"

"বিয়ে? বিয়ে করে কি হবে?"

বউদিদি হাসিয়া কি একটা ঠাট্টা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিজয়বাবু আসিয়া বলিলেন—"সারাদিন খাওয়া হয়নি, যাও, ঝাঁ করে রান্না চড়িয়ে দাও গে, গল্প পরে কোরো এখন।"

জলযোগাদি করিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে লোকজন আসিয়া বৈঠকখানা ছাইয়া ফেলিল। দুই ভ্রাতা গিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিলেন। গুরু সম্পর্কীয়গণকে প্রণাম করিতে

করিতে বিনোদের স্কন্ধে বেদনা ধরিয়া গেল। কেহ কেহ বলিল —"এত দিন বাড়ী আসবার নাম নেই, আমরা ভাবি হল কি, ছোকরা গেল কোথায়! ছেলে বাহাদুর বটে। আজকালকার বাজারে, একশো কুড়ী টাকার চাকরি বাগানো সাধারণ কথা!"

গ্রামের অন্যান্য হতভাগ্য যুবক, যাহারা বি, এ, পাস করিয়া কলিকাতা কন্‌ট্রোলর জেনারেলের আপিসে ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির জন্য উমেদারি করিতেছিল, এম্, এ, পাস করিয়া যাহারা পঞ্চাশ টাকা বেতনের মাষ্টারি জুটাইতে পারিতেছিল না, তাহাদের অনেকেরই কথা পড়িল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"সকলই অদৃষ্টে করে রে ভাই, ও বি এ পাস করলেও হয় না, মহা বি এ পাস করলেও হয় না।"

অনেকে বলিল—"তা বটেই ত"—"তার আর ভুল কি."—নব্য গোছের একজন বলিল—"অদৃষ্ট ত বটেই,—তার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও চাই।"

অন্য একজন মন্তব্য করিল—"বিনোদ বুদ্ধিমান, আমরা বরাবরই বলে এসেছি।" সরকার মহাশয় এ মতের পোষকতা করিয়া বলিলেন—"ছেলেবেলায় একটু দুর্দ্দান্ত ছিল—তা অমন অনেকে থাকে,—একটু বয়স হলেই সেরে যায়। তা হোক চাকরিটি এখন ভালয় ভালয় বজায় থাকুক,—ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হোক, পদবৃদ্ধি হোক, এই আমাদের আশীর্ব্বাদ।"

বিজয় ভ্রাতার পানে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"সেই আশীর্ব্বাদ করুন সরকার মশায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে দাদার বালকবালিকাগণকে লইয়া বারান্দায় বসিয়া বিনোদ বলিল,—"তোদের জন্যে কি নিয়ে এসেছি তা এখনো দেখিস্‌নি বুঝি?"

"কি কাকা?" "কি এনেছ কাকা?"—ইত্যাকার প্রশ্নে বিনোদকে তাহারা ছাঁকিয়া ধরিল। বিনোদ উঠিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া, কাহাকেও একটা রবারের বানর, কাহাকেও একটা লাল বল, কাহাকেও একটা মেম পুঁতুল বিতরণ করিল। তাহা লইয়া বালকবালিকাগণ মহা লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিল। সস্মিত-মুখী বউদিদির পানে চাহিয়া বিনোদ বলিল,—"তোমার জন্যে কি এনেছি জিজ্ঞাসা করলে না বউদিদি?" বউদিদি হাসিয়া বলিলেন —"কি এনেছ ভাই?"

"কি বল দিকিন?"

"কি জানি।"

"কি পেলে খুসী হও?"

"কি পেলে খুসী হই? দাঁড়াও, দেখি। বাঁদর নয়, সে ত ঘরেই রয়েছে—"

বিনোদ কৃত্রিম কোপসহকারে বলিল—"অ্যাঁ, আমার দাদাকে বাঁদর বলছ বউদিদি?"

বউদিদি বলিলেন—"এই দেখ, আমি কারু নাম করেছি? নিজেরা ধরা দিলে আমি আর কি করব?"

বিনোদ বলিল—"মেম পুঁতুলও বোধ হয় চাওনা, সেও ত নিজেই রয়েছ।"

বউদিদি বলিলেন—"না, মোমের মেম পুঁতুল চাইনে বটে। একটি সত্যিকার জেয়ান্ত মেম পুঁতুল যদি বিয়ে করে এনে দিতে ভাই, তা হলে খুব খুসী হতুম।"

"যা এনেছি তা দেখলে আরও খুসী হবে। এই জন্তেই ত এতদিন বাড়ী আসিনি—টাকা জমাচ্ছিলাম। আমার ক্যাশ-বাক্সটা বের কর দিকিন বউদিদি।"

বউদিদি সিন্ধুক খুলিয়া, সবুজ বনাত ঢাকা ক্যাশবাক্সটি বাহির করিলেন। বিনোদ চাবি খুঁজিতে লাগিল। এ পকেট সে পকেট এ জামা সে জামা কোথাও চাবি পাওয়া গেল না। শেষ তোরঙ্গ দুইটা খুলিয়া উলট পালট করিল, কোথাও চাবি নাই।

মুখ খানি বিষণ্ণ করিয়া বলিল—"নিশ্চয় চাবি গাড়ীতে ফেলে এসেছি।" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বউদিদি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"চাবি হারিয়েছ তার আর ভাবনা কি ঠাকুরপো! মাল ত হারাওনি,—বাক্স ত ঘরেই আছে, চাবি হবে এখন। না হয় বাক্স ভাঙ্গতে হবে, এর বেশী আর কি হবে?"

বিনোদ একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার যে হাত খরচের টাকা অবধি বাইরে নেই বউদিদি!"

বউদিদি বলিলেন—"তা তোমার যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে নিও এখন।"

"কলকাতায় গিয়ে বাক্স না খোলালে আর উপায় নেই। এত সাধ করে তোমার জন্তে গহনা গড়িয়ে নিয়ে এলাম, দেখাতে পেলেম না, এই দুঃখ।"

বউদিদি বলিলেন—"না দুঃখ কোরো না। দুদিন পরেই না হয় দেখব। কি এনেছ বলই না—তবু কাণে শুনি।"

"দশ ভরি দিয়ে তোমার জন্তে একযোড়া চুড় গড়িয়ে এনেছি।"

বউদিদি খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। বিনোদ ক্রমে সুস্থ হইল, তখন বলিল,—"বউদিদি, চা তৈরি করতে পার? সকালে চা খাওয়াটা ভারি অভ্যাস হয়ে গেছে।" শুনিয়া বউদিদির মন ভারি সম্ভ্রমে পূর্ণ হইল। ঠাকুরপোর এতদূর সৌখীন চালচলন হইয়াছে! কিন্তু কিছু অপ্রতিভও হইলেন, বলিলেন—"সে পাট ত আমাদের নেই ভাই।" বিনোদ বলিল—"চা আমার কাছে আছে, শুধু গরম জল, দুধ আর চিনি হলেই হয়।"

এই কথা শ্রবণমাত্র বালক বালিকাগণ—"ও কাকা, আমি চা খাব" "ও কাকা আমায় চা দিও" বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

উপযুক্ত পাত্রাভাবে একটা ঘটি করিয়া চায়ের জল গরম হইয়া আসিল। তাহারই মধ্যে একমুঠা চা ফেলিয়া, মুখে পাথরবাটি চাপা দেওয়া হইল। বালকবালিকাগণ কেহ বাটী কেহ গেলাস কেহ বা পাণের ডিপার একটা খোল লইয়া বসিয়া গেল। চা সিদ্ধ হইলে, সেই ঘটিতেই দুধ ও চিনি ফেলিয়া দেওয়া হইল। ঘটির মুখে গামছা দিয়া ছাঁকিয়া, বউদিদি সকলকে 'চা পরিবেশন করিলেন। চা বালকবালিকাগণের উদরস্থ যত হউক না হউক, ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিকটস্থ গ্রামের জমিদার অতুল ঘোষ মহাশয়ের এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা আছে। স্বজাতীয়, সদ্বংশজাত, কৃতী, অবিবাহিত একটি নব্য যুবক বিনোদবিহারী গ্রামে উপস্থিত; অতঃপর ঘটনাস্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা?

সেই দিন অপরাহ্লেই ঘোষজ মহাশয় বিজয় মিত্রের নিকট লোক পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন। মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন—"তা যদি হয়, তার বাড়া আর সুখ কি? বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করি, বিনোদ কি বলে দেখি।"

"বাড়ীতে" বলিলেন—"মেয়েটি চখে দেখা—কিছু নিন্দের নয়। দেওয়া থোওয়া সম্বন্ধে যদি কৃপণতা না করে, আমাদের মান রাখে, তা হলে আর বাধা কি, এই বৈশাখ মাসেই হয়ে যাক।"

মেয়ে পূর্ব্বে হাজার বার দেখা থাকিলেও, বিবাহের সম্বন্ধ হইলে একবার ঘটা করিয়া মেয়ে দেখিতে যাইতে হয়। সুতরাং শুভক্ষণে বন্ধুবান্ধব লইয়া বিজয়মিত্র মেয়ে দেখিতে গেলেন। ঘোষজ মহাশয় অনেক বিনয় প্রকাশ করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু টাকার বেলায় হাজারের বেশী আর উঠিতে চাহিলেন না।

বরপক্ষীয়েরা এ প্রকার অযৌক্তিকতায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল—"এণ্ট্রেন্স পাস করা ছেলে, এল-এ পড়ছে, তারই ত হাজার টাকা বাঁধা। তার কি ক্ষমতা বলুন! যদি চাকরির চেষ্টা করে ত পনেরো টাকা মাইনে জুটলে, খুব সৌভাগ্য।"

কন্যাপক্ষীয়গণ বলিল—"আহা সে যে আলাদা কথা! সে যে পড়ছে। জলের মাছ—কত বড় হবে তার ত ঠিকানা নাই। চাই কি একদিন সে হাইকোর্টের জজও হতে পারে। আর যে কর্ম্মে ঢুকেছে, তার উন্নতি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কি না,—এটা ত স্বীকার করেন?"

ইত্যাদি প্রকার বাদপ্রতিবাদে ঘোষজ মহাশয় দুই হাজারে উঠিলেন। ইহাঁরা বলিলেন—"হাজার নগদ, হাজার গহনা, দানসামগ্রী ও অন্যান্য বাবদ হাজার, এই তিন হাজার নইলে আমরা পেরে উঠব না।"

ঘোষজ মহাশয় বলিলেন—পরে বিবেচনা করিয়া যেরূপ হয় বলিয়া পাঠাইবেন।

"উত্তম কথা।" বলিয়া বরপক্ষীয়গণ শেষবার ধূমপান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন সংবাদ আসিল, অনেক কষ্টে মারিয়া কাটিয়া ঘোষজ মহাশয় আড়াই হাজার পর্য্যন্ত উঠিবেন। ইহাতে যদি হয়, উত্তম,—নচেৎ অগত্যা তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

বিজয়মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন—টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, কুটুম্ব সুখই বেশী প্রার্থনীয়। ঘোষজ মহাশয়ের সহিত কুটুম্বিতার লোভে তিনি আড়াই হাজারেই সম্মত। এখন দিনস্থির হইতে পারে।

বিনোদকে রাজি করিতে কোনও কষ্ট হইল না, কিন্তু হাজার টাকার গহনা শুনিয়া সে ভারি খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। "হাজার টাকায় কি গহনা হবে বউদিদি? এই তোমার জন্যে চুড় গড়ালাম, দুশো পঁচাত্তর টাকা পোনে তেরো আনা লাগল। হাজার টাকায় কখানা গহনা হবে?"

বউদিদি বলিলেন—"হাজার টাকায় কি আর গা সাজানো গহনা হয় ভাই?—নইলে নয় খানকতক, তাই হবে। তারপরে, বেঁচে বর্ত্তে থাক, রোজগার কর, কত গহনা দিবে দিওনা।"

বিনোদ কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। বলিল—"দেখ বউদিদি, এক কায করলে হয় না? ওদের বল, যেন গহনা না দিয়ে গহনার ঐ হাজার টাকা ধরে দেয়। ওতে আর এক হাজার আমরা মিলিয়ে, দু হাজার টাকার পছন্দ মত গহনা আমরা তৈরি করাই। কলকাতায় ত যেতেই হবে বাক্সটা খোলাবার জন্যে।"

বউদিদি কিয়ৎক্ষণ কপালে হাত দিয়া ভাবিয়া বলিলেন—"এ পরামর্শ মন্দ নয়। তাই বলা যাক। মেয়ে ফিরে পাঠাবার সময় আমরা গা সাজিয়ে ফিরে পাঠাব।"

"কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়িয়ে আনতে কতদিন লাগবে বল দিকিন বউদিদি?"

"কতদিন আর? নেবুতলায় অবলাদিদিদের বাড়ী যাবে, বাড়ীতে স্যাকরা ডাকিয়ে, বসে থেকে সাত দিনে গহনা তৈরি করে নেবে। ওরা ত যখন গহনা গড়ায় ঐ রকম করেই গড়ায়।"

বিনোদ বলিল—"ঘোষেরা রাজি হবে ত?"

বউদিদি বলিলেন—"ইঃ, রাজি হবে না ত কি!"

বউদিদি গিয়া স্বামীর সহিত এ বিষয় কথা কহিলেন। বিজয় মিত্র বলিলেন—"রাজি না হবার ত কোনও কারণ দেখিনে।" কিন্তু সব দেখিয়া শুনিয়া তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ ভাবিলেন—"ভায়ার আমার বড় চাকরি হয়েছে কি না, মেজাজটা ভারি বেড়ে গেছে।"

অতুল ঘোষ রাজি হইলেন। একেবারে স্বর্ণশূন্য করিয়া মেয়েকে বিবাহের আসরে নামাইতে পারিলেন না, অত্যাবশ্যকীয় দুই চারি খানা গহনা দিতেই হইল। অথচ হাজার টাকাও দিতে হইল। শেষে সেই তিন হাজারই দাঁড়াইল। সমারোহ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যার নাম শরৎ-কুমারী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের বউদিদি নববধূর মাতাকে বলিলেন, গহনা গড়াইতে একটু সময় লাগিবে, সুতরাং বধূকে দুই সপ্তাহের কম ফিরিয়া দিতে পারিবেন না। মাতা বলিলেন—"তা বেশ, এই ত কাছেই, মাঝে দুই এক দিন পালকী পাঠিয়ে দেব, এক বেলার জন্যে পাঠিয়ে দিও এখন তা হলেই হবে।" সমীপস্থ একজন নবীনা বলিল—"ওগো এখন আর আগেকার মত মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী এসে কাঁদেকাটে না। দু দিনে স্বামী চিনে নেয়।"

বিবাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি বিনোদ কলিকাতা যাইবার নাম করে না। ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা চোখ টেপাটিপি করিল,—বলিল "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।" বউদিদি আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, আর গহনা গড়াতে না দেওয়া ভাল দেখাচ্ছে না ভাই। বউয়ের পিসির সঙ্গে কাল ও

পাড়ায় দেখা হল, জিজ্ঞাসা করলে শরতের গহনা গড়িয়ে এসেছে ?”

বিনোদ বলিল—“আমায় তাড়াতে চাও বউদিদি ? খুব সুহৃদ ত !”

বউদিদি বল্লেন—“বুঝি ভাই, সব বুঝি। এক কায কর, যাতে দুকুল থাকে। ভোরবেলা উঠে কলকাতায় যাও। সারাদিন সেখানে থেকে, সোণা কিনে, স্যাকরা ডাকিয়ে, মাপ দিয়ে, অবলাদিদিদের উপর ভার দিয়ে এস। সন্ধের গাড়ীতে চলে এস, রাত বারোটার সময় পৌঁছবে এখন। আমি তোমার শোবার ঘরে খাবার সাজিয়ে রেখে দেব।”

বিনোদ বলিল—“তোমার কি বুদ্ধি বউদিদি !”

বউদিদি বলিলেন—“এখন আমরা বুড়োসুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদেরও একদিন ছিল কি না ভাই ! এখনও বেশ মনে পড়ে—”

বউদিদি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, সামলাইয়া লইলেন।

বিনোদ বলিল—“বল বল, কি বলছিলে বউদিদি।”

বউদিদি—“না, এমন কিছু নয়।” বলিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিলেন।

বিনোদ চাপিয়া ধরিল। না শুনিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। না বলিলে আড়ি করিবে।

বউদিদি তখন বলিলেন—“ঐ যে বল্লাম শোবার ঘরে খাবার সাজিয়ে রাখার কথা, ঐ থেকে একটা পুরাণো কথা মনে পড়ল। কারুকে না বল ত বলি।”

বিনোদ বলিল—“কারুকে বলব না।”

বউদিদি বলিলেন—“আমাদের তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল। তোমার দাদা হুগলি গিয়েছিলেন আদালতে সাক্ষী দিতে। অনেক রাতে ফেরবার কথা ছিল। শোবার ঘরে খাবার রেখে দেওয়া হয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার দাদা এসে, আমাকে উঠিয়ে, আমাকে সুদ্ধ সেই পাতে একসঙ্গে খেতে বাধ্য করলেন।”

বিনোদ শুনিয়া ভারি আমোদ অনুভব করিল। বলিল—“আমার দাদার এত বুদ্ধি! আমি ভাবি উনি বুঝি চিরকালই কালিকাপুরাণ পড়েন।”

স্থির হইল, আগামী কল্য ভোর রাত্রে বিনোদ কলিকাতা যাত্রা করিবে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল—আহারাদি হইল, শয়নের সময় উপস্থিত হইল। খোলা জানালার কাছে পালঙ্ক টানিয়া, নববধূর সহিত বিনোদ শয়ন করিল। বাহিরে বাগান, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, মিষ্ট বাতাস বহিতেছে।

বিনোদ অন্য দিনের অপেক্ষা আজ নীরব। শরৎকুমারী বলিল—“কি ভাবছ ?”

বিনোদ বলিল—“অনেক দুঃখের কথা।”

কি দুঃখ, শুনিবার জন্য এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিনোদ বলিল—“আমি যদি বলি, তা হলে তুমি আর আমাকে ভক্তি করবে না।”

শরৎ বলিল—“স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনো ভক্তি না করে ?”

বিনোদ বধূর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দুই চারি গুচ্ছ স্খলিত কুন্তল তাহার কপালে লুটাইতেছিল। তাহার চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছিল।

বিনোদ বলিল—"আমি মহা পাষণ্ড। আমি তোমাদের সবাইকে ঠকিয়েছি।"

বালিকা নীরবে বিনোদের পানে চাহিয়া রহিল। বিনোদ বলিতে লাগিল—"আমি মোতিহারিতে চাকরিও করিনে, আমার একশো কুড়ী টাকা মাইনেও নয়।"

শরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল—"তবে কোথায় চাকরি কর?"

"কোথাও করিনে। এলাহাবাদের রেল আপিসে চাকরি করতাম, সে চাকরি গিয়েছে। আর কোনও উপায় না দেখে, বিয়ে করে কিছু টাকা সংগ্রহ করব বলে এ ফন্দি করে এসেছি। জানতাম বড় চাকরি শুনলে বিয়ে হতে এক দণ্ডও দেরী হবে না। তার পর টাকা কড়ি সব নিয়ে পালিয়ে যেতাম।"

কিছু পূর্ব্বে অগাধ সরলতায় ও প্রগাঢ় বিশ্বাসে বালিকা বলিয়াছিল—"স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখন ভক্তি না করে"—কিন্তু প্রভাতের উন্মেষে নিশীথিনীর অন্ধকার যেমন কোথায় দ্রুতপদে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, স্বামীর প্রকৃত পরিচয়ে তার স্বামীভক্তিও কোথায় অন্তর্হিত হইতে লাগিল বালিকা ঠিকানা পাইল না। একটা দারুণ আঘাতের ভারে নীরব হইয়া রহিল।

বিনোদ বধূর স্কন্ধে হাত দিয়া আবার বলিল—"বিয়ের আগে যখন বলেছিলাম, কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়াতে দেব'

তখন এই মৎলবেই বলেছিলাম। গহনা গড়াতে যাবার নাম করে এতদিন কোন্ কালে পালিয়ে যেতাম। তুমিই সব মাটী করে দিয়েছ।”

শরৎ চট করিয়া তাহার হাতের স্পর্শ হইতে স্কন্ধ সরাইয়া লইয়া, বিছনায় উঠিয়া বসিল—“আমি কি করেছি?”

“তুমি সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছ—তোমায় ফেলে যেতে পারিনে। অথচ থাকতেও পারিনে। থাকলে আজ বাদে কাল সব প্রকাশ হয়ে যাবে। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না।”

ক্রোধে ঘৃণায় লজ্জায় বালিকার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তবু জিজ্ঞাসা করিল—“পালিয়ে কোথা যেতে?”

“কয়লার খনিতে যেতাম, এখনও তাই যাব,—সেখানে কন্ট্রাক্টের কায করব—খুব খাটুনি, কিন্তু খুব লাভ।”

শরৎ সহসা বলিল—“আমি সঙ্গে যাব।”

বিনোদও শয্যায় উঠিয়া বসিল। আহ্লাদে বলিল—“তুমি যাবে শরৎ? পারবে?”

“পারব। তুমি কি ভেবেছ তুমি চলে গেলে আমি এখানে বসে লোকের বাক্যযন্ত্রণা সইব? দেশসুদ্ধ ঢী ঢী পড়ে যাবে—যার মুখে যা আসবে সে তাই বলবে, আর আমি বসে বসে শুনব?”

বিনোদের আনন্দ ম্লান হইল। শরতের পলায়ন শুধু আত্মসমর্পণ নহে—আত্মরক্ষাও বটে।

একটু পরে বলিল—“তবে দুজনে পালাই এস।”

“কখন?”

"পরশু ভোরে আমার কলকাতা যাবার কথা, টাকা নিয়ে শোবার আগে হাত বাক্সে টাকা গুছিয়ে এই ঘরে এনে রেখে দেব। রাত একটা কি দুটোর সময় উঠে আমরা পালাব। কয়লার খনির কাছে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে থাকব দুজনে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস। জীবন নতুন করে আরম্ভ করব।"

বালিকা নববধূর মনে রাগের ও দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কি ভাব দ্বন্দ্ব করিতেছিল। মনের দুয়ারে একটা কথা বারবার ধাক্কা দিতেছিল,—"তুমিই সব মাটি করে দিয়েছ।" ভাবিতে মিষ্ট লাগিতেছিল। তাহারই জন্য তাহার স্বামী পলায়ন করিতে পারে নাই—তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। কাঁটাবনের মধ্যে যেন এই একটি মিষ্ট ফল। সেই সুখটুকু মনের মধ্যে ওলটপালট করিতে করিতে সে রাত্রি সে ঘুমাইয়া পড়িল।

তার পরদিন ভোরে বউদিদি বিনোদকে জাগাইতে আসিয়া দেখেন—কেহ নাই। শয্যায় তাঁহার স্বামীর নামে এই পত্র পড়িয়া রহিয়াছে :—

"শ্রীচরণেষু—দাদা, আমি বউকে লইয়া পশ্চিম চলিলাম। আমি আপনাদের সকলকে ঠকাইয়াছি। আমি মোতিহারিতে চাকরি করি না। এলাহাবাদ রেল আপিসে একটি সামান্য চাকরি করিতাম, মদ খাইয়া সেটি হারাইয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া, জুয়াচুরি পূর্ব্বক বিবাহ করাই স্থির করিলাম। অনুসন্ধানে পাছে ধরা পড়ি ডিরেক্টারি খুঁজিয়া দেখিলাম, আমার নামের কেহ কোথাও ভাল চাকরি করে কি না। দেখিলাম মোতিহারিতে একজন বিনোদবিহারী মিত্র ভাল

চাকরি করে। তাহার বেতনের পরিমাণ মুখস্থ করিয়া, বাড়ী আসিয়া বিবাহ করিলাম।

আমার এক পয়সাও নাই, আমার ক্যাশ বাক্সে শুধু ভাঙ্গা কাঁচ বোঝাই করা আছে। বউদিদিদির চুড়ও এখনও তৈরি হয় নাই,—আমার বিবাহে যে হাজার টাকা পণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার জন্য চুড় গড়াইয়া দিবেন। গহনার হাজার টাকা সম্বল করিয়া, ব্যবসায় করা স্থির করিয়াছি। যদি কোন দিন নিজের স্বভাব ও অবস্থা সংশোধন করিতে পারি তবে আবার দেখা দিব। আপাততঃ প্রণামান্তে বিদায়।

সেবকাধম—

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র।"

পত্র পড়িয়া বউদিদি স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ঠাকুরপোর উপর ততটা রাগ হইল না। কিন্তু নিরপরাধিনী বৌয়ের স্বামীসঙ্গগ্রহণেই যেন বেশী খট্‌কা লাগিল, মন আপনা হইতে বলিতে লাগিল—কলি! ঘোর কলি!

ধর্ম্মের কল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিমার মত কন্যা মনোরমা পনেরো বৎসরের বেলায় বিধবা হইয়া গেল।

সেকালের কথা। পিতা বিক্রমপুর হইতে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান এক দিগ্‌গজ কুলীন আনিয়া জামাতা করিয়াছিলেন; দুই বেলা মাছ ভাত খাওয়া এবং সিঁদূর পরিতে পাওয়া ছাড়া মনোরমা আর কোনও সধবা সুখের অধিকারী ছিল না; তথাপি তাহার এই তরুণ বৈধব্যে পিতা মাতা অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। মনোরমাও তাঁহাদের দেখাদেখি দিনকতক খুব কাঁদিল, মুখটি ম্লান করিয়া রহিল। কিন্তু আসলে তাহার নিজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না তার কিবা ছিল, কিবা গেল। মেয়েটির বছর পনেরো বয়স যদিও, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রকৃতি শিশুসুলভ। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের বৃদ্ধি এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

ঠিক এই সময় গ্রামে আর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। ব্রজহরি মুখোপাধ্যায়ের সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র বিনোদলাল পিতা মাতাকে শোকে ভাসাইয়া চিতারোহণ করিল। ব্রজহরির স্ত্রী হৈমবতী অনেকগুলি সন্তানের মুখ দেখিয়াছিলেন। একে একে পাঁচটিকে যমের মুখে সমর্পণ করিয়াছেন। একটি যখন বারো

বৎসরের, তখন সন্ন্যাসীরা তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়,—সে আজ দশ বৎসরের ঘটনা। এখন শুধু একটি রহিল—সেটি দুই বৎসরের। তা যে রকম অদৃষ্ট, উহার আশাই বা কি ভরসাই বা কি!

শোকের প্রথম বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, ব্রজহরি স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন, গৃহ সংসার আর কাহার জন্ম, চল গিয়া তীর্থবাস করা যাউক। বাড়ী, বাগান, বিষয় সব বিক্রয় করিয়া, গোরু বাছুর বিলাইয়া দিয়া, বাস উঠাইয়া, কাশীতে বসিয়া হরিনাম করা যাউক। এই গুঁড়াটুকু যদি বাঁচে, তখন আবার সব হইবে।

কিন্তু সংসারের মায়া বড় মায়া, গৃহত্যাগ করা বড় কঠিন। বাস উঠাইয়া কাশী যাইবার কল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, মাস দুই তীর্থ ভ্রমণ করার পরামর্শই স্থির রহিল।

মনোরমা এই সব শুনিয়া বাড়ী আসিয়া বলিল—"মা আমিও যাব কাকীমার সঙ্গে।" ব্রজহরি হারাধনের দূরসম্পর্কীয় কুটুম্ব—উভয় পরিবারে বহুদিনের সম্প্রীতি। তাহার পিতা মাতা উভয়েই আপত্তি করিলেন। মনোরমা কাঁদা কাটা করিল। এক বেলার এক মুঠা অন্ন, তাহাও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার মা তখন স্বামীকে বুঝাইয়া বলিয়া মত করাইলেন।

তখন নূতন কাশীর রেল খুলিয়াছে;—লোকের তখন কাশী যাইবার ভারি ধুম। যে কাশী যাইতে এক মাসেরও অধিক সময় লাগিত, সেই কাশী দুই দিনের পথ হইয়া পড়িল। ইহাঁদের কাশী যাইবার পরামর্শ শুনিয়া ও পাড়ার কলুগিন্নি আসিয়া

বলিল—"বামুন দিদি, আমাকে যদি নিয়ে যাও সঙ্গে করে তা হলে তোমাদের চরণ সেবা করি, দুটি দুটি পেসাদ পাই, আর বাবা বিশ্বনাথের মাথায় একটু গঙ্গাজল দুটো বিল্লিপত্র দিয়ে আসি।"

কলু গিন্নির প্রার্থনা বিফল হইল না। যাত্রার দিন স্থির হইল ২৮শে ফাল্গুন।

যাইবার উৎসাহে মনোরমা ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। এমন ভাবে চলিতে বলিতে লাগিল, যেন তাহার সর্ব্বনাশ হয় নাই, কপাল যেন পোড়ে নাই, সে যেন সেই মনোরমাই আছে! তাহার এই প্রফুল্লতায় তাহার পিতামাতাও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

কাশীর বিশ্বনাথ অপেক্ষা মগরার রেল দেখিবার জন্যই মনোরমা শতগুণ অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িল। গ্রামের কত লোক কলিকাতা গিয়াছে, বর্দ্ধমান গিয়াছে,—তাহারা যে ব্যাখ্যাটা করে যাহারা কোথাও যায় নাই, তাহারা সাত ক্রোশ দূর ষ্টেশনে গিয়া শুধু রেলগাড়ী দেখিয়া চক্ষু-সার্থক করিয়া আসিয়াছে। সেই রেলে মনোরমা চড়িবে! উঃ—ভাবিতে তাহার বুক গুরগুর করিতে লাগিল; শরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল! শব্দে ভয় করিবে না ত? না জানি সে কি শব্দ! বর্ষাকালে জলে যখন সমস্ত মাঠ ডুবিয়া গিয়াছিল, তখন একদিন অনেক রাত্রে, মার কাছে শুইয়া মনোরমা রেলের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। অতি ক্ষীণ, শুধু একটা অনেক—অনেক দূরের গুম্ গুম্ গুম্ শব্দ।—আঃ—২৮শে ফাল্গুন কবে আসিবে?

মনোরমার আরাধনায় ২৮শে ফাল্গুন আর না আসিয়া

থাকিতে পারিল না। রাত্রি এক প্রহর থাকিতে যাত্রা করিতে হইবে। যথা সময়ে দুইখানি গরুর গাড়ী ভাঙ্গা লণ্ঠনের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া, চক্র-শব্দে সুপ্ত গ্রামবাসীর কর্ণে বিদায়ের করুণ-গীতি গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মগরায় যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন বেলা নয়টা। গাড়ী যখন বাজারে প্রবেশ করিতেছে, সেই সময় অদূরে একখানা এঞ্জিন বংশীধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া মনোরমার যে আমোদ! কাকীমার গলা জড়াইয়া—"ওগো কাকীমা, ওটা কি গো!" বলিয়া আকুল।

একটার সময় পশ্চিমের গাড়ী। দোকানে নামিয়া বিশ্রাম আহারাদি হইল।

যথা সময়ে ট্রেণ ছাড়িল। তখন সহসা সমস্ত উৎসাহ সমস্ত আনন্দ মনোরমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শব্দে, দোলানিতে, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভয়ে জানালার বাহিরে চাহিতেও পারিল না। শেষে হৈমবতীর কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল;—তিনি তাহার কপালে হাত বুলাইয়া আঁচল দিয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

রাত্রি কাটিল। পরদিন মনোরমা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিল। জানালার কাছে বসিয়া মাঠ, ক্ষেত, নদী, পাহাড় দেখিতে ও দুই বৎসর বয়স্ক খোকাকে দেখাইতে লাগিল। পাহাড় দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত!

"কোন কোনও পাহাড় সবুজ গাছে পালায় ভরা, আর কোন কোনটা ওরকম শুকনো পোড়া মতন কেন কাকীমা?"

"সব পাহাড় কি আর সমান হয় বাছা?"

"সব মানুষ কেন তবে সমান?"

"সমান? কই সমান মা?" বলিয়া হৈমবতী মুখ ফিরাইয়া, একবিন্দু জল চক্ষু হইতে আঁচলে লইলেন।—কাহার জন্য?

তাহার পরদিন প্রভাতে মোগলসরায়ে নামিতে হইল। সেখানে অনেক পাণ্ডা আসিয়া বসিয়া আছে। একজন ব্রজহরিকে দখল করিয়া ফেলিল।

মোগলসরাই হইতে অন্য গাড়ীতে রাজঘাট। রাজঘাট ষ্টেসন ঠিক গঙ্গার উপর। ওপারে কাশীর সৌধমন্দিরমালা নবরৌদ্রালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে। পুণ্যময়ী জাহ্নবী সফেন তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া ট্রেণ শুদ্ধ লোক—"জয় বাবা বিশ্বনাথজীকি জয়" বলিয়া বারম্বার উন্মত্তবৎ চীৎকার করিতে লাগিল।

ইহাঁরাও কাশীর পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া প্রণাম করিলেন। হৈমবতী বলিলেন—"জয় বাবা বিশ্বনাথ—হে অন্নপূর্ণা—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো। এত সাধু সন্ন্যাসী এখানে তোমার সেবা করছে আমার বাছাকে যেন দেখতে পাই। দেবাদিদেব মহাদেব, বাবা বিশ্বনাথ, দোহাই বাবা সাত দোহাই তোমার।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথ বিশ্বের অল্প লোকেরই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া থাকেন; হৈমবতী সেই অল্পের একজন পরিগণিত হইলেন। তিনি দশ বৎসরের হারানো পুত্রের দেখা পাইয়াছেন।

সে দিন তাঁহারা কালভৈরবের বাড়ী পূজা দিতে যাইতে-ছিলেন, পথে সাধনানন্দ স্বামীর মঠ। পাণ্ডা বলিল—"মাঈ সধ্-নানন্দ সোয়ামিজিকো দেখ্‌বি না? বড়া ভারি মহাৎমা আছে।" সকলে সাধনানন্দ স্বামীকে দর্শন করিলেন। স্বামী তখন শাস্ত্র-ব্যাখায় নিযুক্ত। কয়েকজন গৈরিক বসনধারী নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া তাহা শ্রবণ ও তৎসম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিতেছেন। এই শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে হৈমবতী তাঁহার শশিভূষণকে চিনিতে পারিলেন।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। যে ছিল দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, সে এখন পূর্ণাবয়ব দীর্ঘায়তন নবীন যুবা পুরুষ হইয়াছে। তপশ্চর্য্যার ফলেই হউক, যে কারণেই হউক, তাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত প্রভাসম্পন্ন। মস্তকের তাম্র জটাভার ললাটের ঊর্দ্ধপ্রান্তে বিচিত্র চিত্র রচনা করিয়াছে!

তাহাকে পাইয়া তাহার পিতা মাতা যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে কিছুতেই সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। এমন কি মঠ ছাড়িয়া পিতা মাতার সহিত কেদার ঘাটের বাসায়ও থাকিতে সম্মত হইল না। তবে প্রত্যহ আসিয়া সারাদিন ইহাঁদের সঙ্গে যাপন করিত।

সপ্তাহ কাল এই ভাবে কাটিলে, একটু গোলযোগ ঘটিল। যতদিন হইতে উপন্যাস লেখার সৃষ্টি হইয়াছে,—কোন কোনও

পণ্ডিতের মতে আরও পূর্ব্ব হইতেই—অর্থাৎ যতদিন হইতে পৃথিবী নরনারীসম্পন্ন এবং নরনারী হৃদয়নয়নসম্পন্ন হইয়াছে—ততদিন হইতেই এ গোলযোগ ঘটিয়া আসিতেছে। অন্যের, ও প্রথম প্রথম নিজেরও অগোচরে এই সন্ন্যাসীবর মনোরমার প্রতি একটু বেশীরকম চাহিতে লাগিল। সে দেখে আর দেখে আর দেখে। মনোরমারও বুকের মধ্যে কেমন একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। কেমন একটা অশোয়াস্তি, একটা সুখ।

একদিন এই চোখের ও বুকের ভাষা, মুখের ভাষায় পরিণত হইবার উপক্রম করিল।

সেদিন প্রাতঃকাল। শশী আসিয়া দেখিল, মনোরমা বসিয়া দুধ জ্বাল দিতেছে—খোকা ঘুমাইতেছে—গৃহে আর কেহ নাই। শুনিল তাহার পিতা মাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, কলুগিন্নি বাজারে গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আজ গঙ্গাস্নানে যাওনি?"

"আমার একটু অসুখ করেছে।"

শশী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অসুখ করেছে? হাত দেখি?"

মনোরমা হাত বাড়াইয়া দিল, হাসিয়া বলিল—"তুমি বদ্দি না কি?"

উত্তর না করিয়া শশিভূষণ নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর কপালে হাত দিল, বলিল—"ইস, খুব গরম যে?"

মনোরমা হাসিয়া বলিল—"খুব বদ্দি হয়েছ! আমার মোটেই জ্বর হয়নি।"

"হয়নি ত কি! তোমার কপাল ভারি গরম।"

"ও বোধ হয় আগুন তাতে বসে থেকে।"

"আচ্ছা আগুনের কাছ থেকে সরে এস, দেখি ভাল করে হাত," বলিয়া শশিভূষণ মনোরমার হাতটি ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া তাহার সুন্দর কোমল হাত নিজের একটি হাতে সতৃষ্ণভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, অন্য হাতের অঙ্গুলি দিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। মনোরমার মনে কি রকম একটা ভয় হইতেছিল। একটা যেন না—না—শব্দ উঠিতেছিল। তাহার পা স্পষ্টই কাঁপিতেছিল, আর বোধ হয়, শরীরও। শশী বলিল—

"মনো।"

এই প্রথম "মনো" বলিল—পূর্ব্বে বরাবর মনোরমা বলিয়াছে। মনোরমা বলিল—"কি?"

ভারি আশ্চর্য্য! চুপি চুপি "কি" বলিবার এমন কি প্রয়োজন ছিল? বোধ হয় হৃদয়যন্ত্রের অভ্যন্তরে রক্তটা একটু বিশেষভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকিলে, কথার স্বরটা ভারি নামিয়া যায়।

কিছুক্ষণ কাটিল,—আর কোন কথা হইল না।

শেষে বাহিরে কলুগিন্নির স্বর শোনা গেল:—"ওমা এরা যে এখনো ফেরে না গো! ঠাকুর দেখে ফিরবে না কি? আমি তবে যাব কার সঙ্গে?"

শশী মনোরমার হাত ছাড়িয়া বাহির হইল। বলিল—"কলুগিন্নি কোথা গিয়েছিলে?"

কলুগিন্নি বলিল—"কে? দাদাঠাকুর? পেরণাম হই। দেখনা! আধ পয়সার এই রস্তা থোড়! দেশে হলে কেউ ছোঁয়ও না। বল্লাম ত মাগী ক্যারোড় ব্যারোড় করে কি বল্লে কিছুই বুঝতে

পারলাম না। গাল দিচ্চে মনে করে আমিও যা নয় তাই বলে গাল দিয়ে চলে এলাম।"

শশিভূষণ এ নালিসে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে দিন সারাদিন আর শশী আসিল না। মঠে গিয়া নিজের ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, যেন নেশা হইয়াছে। মাথাটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

মস্তিষ্ক একটু শীতল হইলে, মনে হইতে লাগিল আজ সে মহা একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে।

নিজের চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় সে অনবগত ছিল না। তাহার জন্য সে নিজেকে ক্ষমা করিত। এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য পূর্ব্বেও কখন কখন হইয়াছে—কিন্তু মনের পাপ, কর্ম্মে কখন আত্মপ্রকাশ করে নাই। এ চাঞ্চল্য রক্ত মাংসের অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম,—উন্মূলন করিবার উপায় নাই। সহ্য করিতে হইবে, সংযত থাকিতে হইবে। ইহাই ধার্ম্মিকের সজ্জনের কর্ত্তব্য। কিন্তু অদ্য প্রভাতে যে সংযম তাহার কোথায় গেল? আজ সে কি করিয়া বসিল! আর ত কখনও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোনও স্ত্রীজাতিকে সে স্পর্শ করে নাই; আজ কি হইল!

নিজের প্রতি ধিক্কারে, অনুশোচনায় শশিভূষণ অস্থির। উঃ—এই তার সন্ন্যাস ধর্ম্ম! এত গর্ব্ব—এত তেজ—সব মুহূর্ত্তের মধ্যে পথকর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইল!

পুরাণ স্মরণ করিল—অপ্সরা পাঠাইয়া দেবতাগণ মুনিজনের তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেন—চিৎশক্তির পরীক্ষা লইতেন। সে কত কঠিন পরীক্ষা! তাহার তুলনায় একি? কিছুই নয়—পরীক্ষাই নয়। তবু ত তাহার এই লজ্জাকর পরাজয়!

ক্রমে মনে হইল,—মুনিগণের অযুত বর্ষের সাধনা,—সে ত পরশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র! আর, এ দশ বৎসর সে যাহা করিয়াছে তাহা ত তপস্যাও নহে।—খানকতক ব্যাকরণ পড়িয়াছে—কাব্য পড়িয়াছে—দর্শনের সূত্র মুখস্থ করিয়াছে—শ্রুতির ভাষ্য নকল করিয়াছে মাত্র!

একটু একটু করিয়া তাহার মনে সান্ত্বনার আলো ক্রমে পড়িতে লাগিল। ভাবিল, আ মরি, মুনিগণই বা কি চিৎ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—অধিকাংশই ত পরাজিত!

পুরাণের আরও অনেক কথা মনে পড়িল, তাহাতে আত্ম-সান্ত্বনার পথ আরও পরিষ্কৃত হইতে লাগিল।

তখন চিন্তা করিল—এ ভ্রম মনে পোষণ করা কেন? সে ত সন্ন্যাসী নহে; বিদ্যা শিক্ষার জন্য এত দিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেছিল মাত্র।

তাহার পিতা মাতার সপ্তাহব্যাপী করুণোক্তিগুলি ক্রমে ক্রমে মনে পড়িতে লাগিল।—"আমার আর কেউ নাই বাবা—বাড়ী চল—আমার ঘর অন্ধকার—আমার চক্ষের মণি তুমি—বিয়ে কর,—বিয়ে করে সংসারী হও!"

ধর যদি সে বিবাহই করে,—যদি সে সংসারীই হয়,—তাহা হইলে কি হয়?

কি ভয়ানক,—তাহা কখনও হয়? গুরু সাধনানন্দ বলিবেন কি! সহাধ্যায়ীবৃন্দ—বালগোপাল, করুণাকন্দ, মাধো উপাধ্যায়, সীতাপতি বলিবে কি!

তখন ভাবিল—কি আশ্চর্য্য! কে কি বলিবে না বলিবে তাহাই ধরিয়া সে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবে! কি বলিবে? যাহা ইচ্ছা বলুক, যত পারে হাসুক, যত ছিলিম খুসী গাঁজা ভস্ম করুক। তাহার তাহাতে কি আসিয়া যাইবে?

নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। এ চুল নাই, গৈরিক বসন নাই, দেশে গিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে। ঘরে বধূ—দেখি কেমন বধূ?—মনোরমা। ছি! মনোরমা নহে —আর কেহ। কিন্তু মন মানিল না। বালকের হাত হইতে একটি খেলনা কাড়িয়া লইয়া সেটি লুকাইয়া অন্য শত শত খেলনা তাহার হাতে দিলে সে যেমন আছাড়িয়া ফেলে, শশিভূষণের প্রণয়শিশুও সেইরূপ মনোরমা ভিন্ন অন্য কোনও দেবী, নারী বা কিন্নরীকে বধূত্বে গ্রহণ করিতে চাহিল না!

তখন হঠাৎ এক বৎসরের পুরাতন একটা ঘটনার কথা মনে হইল। এক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক শিষ্য, বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিচার করিতে কাশী আসিয়াছিলেন। কাশীর পণ্ডিতসমাজে সে কি উত্তেজনা তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! লোকে সে পণ্ডিতকে কত না বিদ্রূপ করিয়াছিল—কত না কঠিন কথা বলিয়াছিল। একজন প্রস্তাব করিয়াছিল, ইহার টিকি কাটিয়া, আঠা দিয়া পশ্চাৎ ভাগে জুড়িয়া লাঙ্গুল বানাইয়া দাও।

সেই পণ্ডিতের যুক্তিতর্ক শশী মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। জানালা খুলিয়া ঘরে আলো আনিয়া নিজের পুঁথি পত্র পাড়িল। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, রঘুনন্দন,—পাতা উল্টাইয়া বিসংবাদের শ্লোকগুলি পড়িতে লাগিল, তাহার টীকা ভাষ্য পড়িল; স্বার্থের নূতন আলোকে, সকল শ্লোকের অনুকূল অর্থই উপলব্ধি করিল।

বিধবা বিবাহের আইন লইয়া বঙ্গদেশে কি প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল সে জানিত না। সে ছিল কাশীতে। কাশীর পণ্ডিতগণ বিরোধ উত্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুই একজন মতও দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের উদ্যোগে আইন পাশ হইল বলিয়া, কাশীর পণ্ডিতগণ তাবৎ বাঙ্গালীকে খৃষ্টান বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। সুতরাং শশিভূষণ সিদ্ধান্ত করিল, বাঙ্গালীর চক্ষে এটা আর নিন্দনীয় নহে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থির করিল, মনোরমাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবে। এই সকল শাস্ত্র দেখাইয়া. যুক্তি দেখাইয়া উভয়ের পিতা মাতাকেই স্বমতে আনয়ন করিবে। হায় বালক!

যখন বাহির হইল, তখন বিশ্বেশ্বরের আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। দলে দলে লোক মন্দিরাভিমুখে ছুটিয়াছে। কি সুন্দর সুগম্ভীর দৃশ্য! সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রময় বন্দনা গান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আরতির পর শশিভূষণ কেদারঘাটের বাসায় আসিল। দেখিল, বাড়ীতে মনোরমা ছাড়া আর কেহই নাই। শশীকে দেখিয়া মনোরমা আহ্লাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"মনো—সবাই কোথা ?"

"তাঁরা সব আরতি দেখতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি ত।"

"আমিও ত আরতি দেখতে গিয়েছিলাম, ভীড়ে বোধ হয় তাঁদের দেখতে পাইনি। তাঁরা অন্নপূর্ণার আরতি দেখে ফিরবেন হয় ত। কেমন আছ মনো ?"

"ভাল আছি। সারাদিন আসনি কেন ?"

"এই এবার যে এলাম, এখন আর শিগ্‌গির যাচ্চিনে—তা জান ?"

"সত্যি ? মঠে যাবে না ?"

"না, মঠ ছেড়ে দিয়েছি। এবার সংসারী হব, বিয়ে করব মনো।"

"সত্যি ?—কাকীমা তা হলে কত খুসী হবেন। কত ঠাকুরদেবতাকে মানত করেছেন।" বলিয়া মনোরমা ঘামিতে লাগিল।

দুই জনে অনেক কথা হইল। যে কথা চোখে চোখে অনেকবার হইয়া গিয়াছিল,—সেই কথা মুখে মুখেও হইল। শশী বলিল—বিধবার বিবাহ এখন শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে। সে উভয়ের পিতামাতাকে বুঝাইয়া, তাহাকে বিবাহ করিবে।—মূঢ় বালিকা সংসারের কিছুই জানিত না;—এই কথা ধ্রুব বলিয়া বিশ্বাস

করিল। বিধবার বিবাহ হইবে এমন একটা গুজব সেও শুনিয়াছিল কি না। শশিভূষণকে মনে মনে স্বামী বলিয়াই গ্রহণ করিল।

শশী বলিল—"আজ রাত্রেই তবে মাকে বলি।" মনোরমা বলিল—"না—দেশে গিয়ে বোলো।"

শশী মনোরমার হাতটি ধরিয়া বলিল—"কেন মনো?"

"তা হলে আমার ভারি লজ্জা করবে। আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারব না। এক বাড়ীতে যতদিন আছি, ততদিন বোলো না তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।"

শশী বলিল,—"তবে দেশে গিয়েই বলব।"

পিতা মাতা ফিরিলেন। শশীর মা যখন শুনিলেন, শশী আর মঠে যাইবে না, বাড়ীতেই থাকিবে,—তিনি হাতে স্বর্গ পাইলেন। মনের সুখে বেশী করিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—এই ছুইটি যুবক যুবতীও বেশী করিয়া পরস্পরের সঙ্গলাভ করিতে লাগিল।

শশীর পিতামাতা বড় অদূরদর্শী।—অবশ্য শশী বা মনোরমা যে পরস্পরকে বিবাহ করিবার কথা ভাবিতেও পারে, এ তাঁহাদের মস্তিষ্কেই প্রবেশ করে নাই। তথাপি এ ছুইজনের প্রতি তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য ছিল—ইহাদের নিভৃত সাক্ষাতের অবসর দেওয়া অবশ্যই তাঁহাদের উচিত ছিল না। কিন্তু ছুইটি কারণে তাঁহাদের এ অন্ধতা উপস্থিত হইয়াছিল—তাহা সন্তানস্নেহ এবং শশীর বিদ্যাবুদ্ধি ও ধার্ম্মিকত্ব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষে দেশে ফিরিবার সময় হইল।—শশীর মাতা ক্রমাগত মনোরমার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, কাহার মেয়ের সঙ্গে শশীর বিবাহের সম্বন্ধ করা যাইবে। একদিন নির্জ্জনে শশীর কাছে এই সব গল্প করিতে করিতে মনোরমা বলিল—"মাকে যখন তুমি বলবে যে আমাকেই বিয়ে করবে, আর শাস্ত্র থেকে সব দেখিয়ে দেবে যে হতে আছে—তখন মার ভারি আহ্লাদ হবে—বোধ হচ্চে।"—মনোরমা মনে করিত এই আমার শ্বশুর এই আমার শাশুড়ী। ভাবিত, আমি যে ইহাঁদের পুত্রবধূ হইব, তাহা এখন জানিতেও পারিতেছেন না,—কি মজা।

সকলেই দেশে ফিরিলেন।—শশিভূষণকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার বাঙ্গালা কেমন বাঁকা বাঁকা হিন্দী সুরের হইয়া গিয়াছে। তাহার সংস্কৃতে অধিকার দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গেল।

হৈমবতী দেশে আসিয়াই শশীর বিবাহের জন্ম পাত্রী খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।—শশী তাঁহাকে বলিল—"মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

কথাটা বলিল।—শুনিয়া মা আকাশ হইতে পড়িলেন।

শশী বলিল—"সে কি মা! শোন নি? বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত হয়েছে,—আইন হয়েছে।"

মা বলিলেন—"আইনের মুখে আগুন!—ইংরেজরা ম্লেচ্ছ—ওরা আইন করবে না কেন?"

"ইংরেজরা ম্লেচ্ছ—বিদ্যাসাগর মশায় যে পরম পণ্ডিত, পরম হিন্দু। তিনি প্রমাণ করেছেন—"

মা বিদ্যাসাগরের প্রতি এমন একটা কটূক্তি করিলেন—যাহা লেখনীর মুখে আনয়ন করা অসাধ্য।

শশিভূষণ ভারি হতাশ হইল। ভাবিল মা নিরক্ষর—আমার পিতা শাস্ত্রদর্শী—তিনি বুঝিবেন।

পিতা শুনিয়া কাণে আঙুল দিয়া কহিলেন—"ছি ছি ছি—এতদিন শাস্ত্র চর্চ্চার এই ফল তোমার!"

শশী শাস্ত্রের তর্ক পাড়িতে চাহিল। পিতা বলিলেন—"মহা-ভারত! এ কথার আলোচনাতেও পাপ আছে।"

শশী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিল। পিতা বলিলেন—"বিদ্যাসাগর গোরু খায়। এ কথা আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"*

ইহার অপেক্ষা প্রবলতর বিরুদ্ধযুক্তি আর কি হইতে পারে? শশী যখন দেখিল, পিতার কাছেও কূল পাইল না,—তখন হতাশ হইয়া নিজের শয়ন কক্ষে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিল।

* * *

ঠিক এই সময়, ও পাড়ায় একটি কুটীরে শশিভূষণের নাম উচ্চারিত হইতেছিল।—কলুগিন্নি তাঁতিদিদির সহিত কাশীর গল্প করিতেছিল। তাঁতিদিদি বলিল—"আহা, বামনীর ভাগ্যি

---

* একবার কোথাকার ষ্টেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এক পণ্ডিতের দেখা হয়। পণ্ডিত জানিত না যে ইনিই বিদ্যাসাগর। সে তর্কের মুখে বলিয়াছিল—"বিদ্যাসাগর হ্যাট্ কোট্ পরে হোটেলে খায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"বিদ্যাসাগরকে চেন তা হলে?" "চিনি না? বিলক্ষণ চিনি। কতবার দেখেছি।" এ গল্প বিদ্যাসাগরজীবনীতে প্রাপ্তব্য।

লেখক।

ভাল। সে ছেলেটা যখন মরে গেল, আমরা মনে করলাম মাগী শোকে পাগল হয়ে যাবে।—ধর্ম্ম কর্ম্মের ফল আছে বৈ কি দিদি, এই দেখ ধর্ম্ম করতে কাশী গেল বলেই না হারাছেলেটিকে পেলে। খাসা ছেলে রাজ পুত্তুরের মত চেহারা, নিষ্ঠের শরীর কিনা।"

কলু গিন্নি মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"নিষ্ঠের কথা আর বলে কায কি! কলিকালে আবার ধর্ম্ম আছে না নিষ্ঠে আছে!"

তাঁতিদিদি শুনিয়া অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল— "কি রকম—কি রকম?"

"কি রকম আবার—আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

অতঃপর চুপি চুপি অনেক কথা হইল:—তাঁতিনী শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল,—"অ্যাঁ! গলায় দড়ি গলায় দড়ি!"

কলুগিন্নি অবশ্যই সাবধান করিয়া দিল,—"কাউকে বলিসনে দিদি—দরকার কি আমাদের কারু কথায় থাকবার। যে আগুনে হাত দেবে সে নিজেই পুড়ে মরবে।"

তাঁতিনী বলিল—"দরকার কি বোন্, এ কথা কি আর কাউকে বলবার না কারু শোনবার!—কাউকে বলতে হবে না— ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে যাবে।"

সপ্তাহ মধ্যে—গ্রামে টী টী পড়িয়া গেল।

হারাধন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজহরির বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দুয়ার বন্ধ করিয়া দুজনে অনেক পরামর্শ হইল। ঘণ্টাখানেক পরে ব্রজহরি বাহির হইয়া শশিভূষণকে আনিয়া সেই ঘরে দুয়ার বন্ধ করিলেন।

ইহার পরদিন হারাধন প্রচার করিলেন, তাঁহার কন্যা

মনোরমার হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হইয়াছে; ডাক্তার দেখাইতে কলিকাতা যাইবেন। সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস পরে গ্রামের লোক শুনিল, শশিভূষণ আবার কাশীর মঠে ফিরিয়া গিয়াছে। আরও কয়েক দিন পরে শুনিল—মনোরমার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সুপারিশের চিঠি দিয়া, "——"কলেজে শশিভূষণকে কাব্যসাহিত্যের অধ্যাপক করিয়া পাঠাইলেন।

এখন শশিভূষণ পেন্সন লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। ছেলে মেয়ে অনেকগুলি। মাঝে মাঝে সুপক্ক টিকি নাড়িয়া, হাতখানি হাতে লইয়া সস্নেহে স্ত্রীকে বলেন্—"বলি ব্রাহ্মণি, তোমার হৃদ্‌রোগটা কেমন আছে?"

প্রণয় পরিণাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুবয়েজ্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাণিকলাল, প্রতিবেশী বালিকা কুসুমলতার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন—"কে এমন প্রেমিক আছে যে প্রথম দর্শনেই ভাল বাসে নাই?"—কেন, আমাদের মাণিকলাল! কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে, গাছের মগ ডালে উঠিয়া তাহাকে ছানাসুদ্ধ পাখীর বাসা পাড়িয়া দিয়াছে, ঘোড়া সাজিয়া পৃষ্ঠে তাহাকে বহন করিয়াছে, কিন্তু তখন ত কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই। কে জানে, হয়ত সে মনের মনে, হৃদয়ের হৃদয়ে ভাল বাসিত, অন্তরের সুগোপন অন্তস্তলে সে প্রচ্ছন্ন প্রবাহের অস্তিত্ব নিজেও অবগত ছিল না।

মাণিক নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িয়াছে সংপ্রতি মাত্র। সে দিন মাণিক কুসুমদের বাগানে, পেয়ারা পাড়িতে গাছে উঠিয়াছিল। কুসুম তাহার মাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া

বাড়ী ফিরিতেছে। কুসুমের পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত,—পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাজির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোণালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। দেখিয়া মাণিক হৃদয় হারাইল।

ইহারা চলিয়া গেলে পর, মাণিক তাহার অন্তরে যেন এক অপূর্ব্ব আলোকের রশ্মি প্রতিভাত দেখিল। সে আলোক তাহার মনোদেহের প্রতি পরমাণুটিকে যেন বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলোক, মন অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহার চক্ষুযুগলে আসিয়া উপনীত হইল এবং নিমেষের মধ্যে নিখিল বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই নবীন আলোকে মাণিক আকাশের পানে চাহিল—আকাশ আশ্চর্য্য নীল,—এমন কখনও দেখে নাই ;—বসুন্ধরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বসুন্ধরা আজ পরমা সুন্দরী। দূরে দীর্ঘিকাতীরে ঘুঘু ডাকিতেছে,—উকু পাখী কলরব করিতেছে, 'বউ কথা কও' মাঝে মাঝে পঞ্চমে ঝঙ্কার দিতেছে ; পাখীর ভাষায় যেন আজ নূতন প্রাণ, নূতন সুর। মাণিক নিশ্বাস ফেলিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া বাকী সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেষতঃ কোসো পেয়ারায়—আর তাহার চিত্ত নাই।

সে দিন রবিবার ছিল—স্কুল যাইতে হইবে না। আহতবৎ মন্থরপদে বাড়ী আসিয়া, মাণিক পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল।

পড়িবার জন্ত ? হায়, না, পুড়িবার জন্ত, চিন্তার অনলে নিজের হৃদয়কে আহুতি দিবার জন্ত। শতরঞ্চ বিছান মেঝেতে ডিক্সনারি মাথায় দিয়া মাণিক চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

মাণিকের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। এই বয়সেই সে বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছে রাশি রাশি। 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর,' 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' হইতে আরম্ভ করিয়া, বটতলার 'পারুল বালা' 'সোহাগিনী,' 'বউরাণী' প্রভৃতি কিছুই আর বাকী নাই।

শুইয়া শুইয়া মাণিক আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দুঃখ যেন তাহার হৃদয়ে আর ধরিতেছে না,—উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে। "কেন দেখিলাম! হরি হরি কি দেখিলাম! দেখিলাম ত মরিলাম না কেন? আমার মনে এ আগুন—এ কুলকাঠের আঙার—কে জ্বালিল রে? নিবিবে কি? কতদিনে—হায়—কতদিনে?"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিয়ৎ পরে, শিশ্ দিতে দিতে, লম্ফ দিয়া মাণিকের সহপাঠী বন্ধু বিপিন ও শরৎ প্রবেশ করিল। বিপিন আসিয়া একেবারে মাণিকের চুল ধরিয়া বলিল—"কি রে ইশটুপিটু, ঘুমুচ্ছিস না কি? মার্ব্বেল খেলবিনে?"

মাণিক উঠিয়া বিপিনের গালে হঠাৎ এক চড় কসাইয়া ফিরিয়া বিপিন হতভম্ব। শরৎ বলিল—"তোর হয়েচে পাইল। মারামারি করতে চাস্,—আয়।" বলিয়া শরৎ রহিল না। গুটাইতে লাগিল। সৌহার্দ্য বোধ

বিপিন বলিল—"আঃ শরতা কি করিস্।"

ফিরিয়া বলিল—"লেগেছে ভাই, রাগ করেছিস্ কে বলিল—"গঙ্গার

মাণিক বলিল—"মানুষ শুয়ে রয়েছে, চুল ধরে টানলি কি বলে ?"

শরৎ মাণিকের চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল—"আহা এ রকম করে টানলে বুঝি আবার লাগে ?" তাহার আশা ছিল, তাহাকেও মাণিক চড় মারিবে, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ শরৎ তাহার সহিত ঘুঁসি লড়িতে আরম্ভ করিবে।

কিন্তু শরতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। মাণিকের ক্রোধ নিরীহ বিপিনের উপরই সবটা খরচ হইয়া গিয়াছিল। মাণিক সটান আবার শুইয়া পড়িল।

শরৎ বলিল—"না খেলিস্ না খেলবি,—ভারি ত বয়েই গেল কি না।" বলিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া বলিল—"চল্ রে বিপ্‌নে।"

বিপিন যাইবার সময় বলিয়া গেল—"মাণিক রাগ করিস্‌নে ভাই—যদি লেগে থাকে তোর, বিলক্ষণ শোধ ত নিয়েছিস্।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'াণিক আর ফুট্‌বল খেলে না,—জিম্‌ন্যাষ্টিক্ করা একেবারে 'দিয়াছে,—দ্বিপ্রহরে ইস্কুল পালাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া 'খ। প্রভাতে, সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ী দেখিয়া আসে।

' দেখিতে খুব সুন্দরী না হউক, মুখখানি বেশ মাতার শেষের সন্তান—ভারি আদরের মেয়ে।

কুসুম এই কার্ত্তিক মাসে এগারো বছরে পড়িয়াছে। দুই এক স্থানে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে, কিন্তু এখনও পাকাপাকি কোথায়ও স্থির হয় নাই।

মাণিক ক্রমাগত কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া, কথা কহিয়া, জিনিষ দিয়া তাহার সঙ্গে একটু বেশ ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। মাণিকের প্রতি কুসুমেরও একটা টান দেখা যাইতে লাগিল।

বৈশাখের শেষে, কলেজ বন্ধ হওয়াতে, মাণিকের এক পিস্‌তুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মাণিক অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে কতকটা গুরুজন বলিয়া গণ্য করিত এবং ভয় করিয়া চলিত। প্রভাস আসিলেই মাণিককে পড়া জিজ্ঞাসা করিত, আঁক কষিতে দিত, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, অসৎসঙ্গের দোষ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশাদি দিত।

কিন্তু বন্ধুগণের মধ্যে প্রভাস একজন নীরব কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমান্স, কেবল প্রেম-পাত্রীর অ[illegible]াবে কোন মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।

সে [illegible]য়া মাণিকের ভাবগতিক দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে [illegible]ল—ব্যাপারটা কি ?

[illegible] কিছুই স্বীকার করে না। সন্ধান করিয়া করিয়া শে[illegible] প্রভাস মাণিকের কবিতার খাতা হাতে পাইল। [illegible]্যাপার কিছুই আর বুঝিতে বাকী রহিল না। [illegible] তাহার ভারি ভক্তি ও সৌহার্দ্য বোধ

[illegible] বার খাইয়া প্রভাস মাণিককে বলিল—"গঙ্গার

ধারে বেড়িয়ে আসা যাক্ চল।" মাণিক প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল,—কিন্তু প্রভাস অনেক জিদ্ করিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া, তীরে উঠানো এক ভাঙ্গা নৌকার গায়ে দুইজনে উপবেশন করিল।

প্রভাস বলিল—"আমি সব জান্‌তে পেরেছি?"

মাণিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি?"

"তোমার গোপন কথা।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই সিগারেটের বিষয়। ডেস্কের মধ্যে লুকানো বার্ডসাই, কাগজ প্রভৃতি প্রভাস দাদা বোধ হয় দেখিতে পাইয়াছে, সুতরাং সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—"মেলা চালাকি কোরো না যাও।"

প্রভাস বলিল—"এ চালাকির কথা নয়—খুব গুরুতর কথা। জীবন মরণের সমস্যা।"

এবার মাণিক যথার্থ বিষয়টি সন্দেহ করিল। বলিল—"কি হয়েছে কি? কি বিষয় বলই না।"

প্রভাস দূরস্থিত মৃদুগামী নৌকার পানে দৃষ্টি [illegible] করিয়া বলিল—"তোমার ভালবাসার বিষয়।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই বাবাকে বলিয়া দি[illegible] মার-খাওয়াইবে। সুতরাং শত্রু ভাব ধারণ করিয়া [illegible] ইয়া বলিল—"আহা যা বল্লে আর কি! ইয়ার্কি ভা[illegible]

প্রভাস বলিল—"ভাই—আমার কাছে আ[illegible]

আমি সবই জেনেছি! তোমাদের দুঃখে[illegible]

তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি[illegible]

মাণিক আশ্বস্ত হইল। একটু অপ্রতিভও হইল। বলিল—"কে বল্লে তোমায়?"

নৌকার গায়ে জুতা ঠুকিতে ঠুকিতে প্রভাস বলিল—"তোমার কবিতার খাতা দেখেছি। আমাদের অতুল বাঁড়ুয্যের মেয়ে কুসুম ও?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাই বটে।

"তোমার কবিতা থেকে যেন বোঝা যাচ্চে, আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল,—তাই কি?"

মাণিক শার্টের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—"মনে ত হয়।"

"স্পষ্ট কখনো বলেছে?"

"না।"

"তুমি কখনো তাকে স্পষ্ট করে বলেছ?"

"না।"

ইহার পর দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে প্রভাস বলিল:—

"দেখ ওরা আমাদের স্বঘর। মিলন হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু মা বাপকে জানানর আগে, কুসুমের মন জানা দরকার। অনুমান ফনুমান নয়, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

মাণিক বলিল—"সে কখনো পারা যায়?"

প্রভাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"সে না পারলে চলবে কেন? তুমি যদি সত্যই ওকে লাভ করতে চাও, তা হলে এ বিষয়ে যা কিছু কর্ত্তব্য সব তোমায় সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে কি করে হবে? আর, দেরী করলেও চলবে না। কুসুমের

কত জায়গায় বিয়ের কথা হচ্চে কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যাবে। তখন চিরদিনটে তোমায় আপশোষ করতে হবে।”

এ কথা শুনিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এত দিন সে শুধু ভালই বাসিতেছিল। বিবাহ প্রভৃতির কল্পনা কখনো করে নাই। এখন মনে হইতে লাগিল, বিবাহ হইলে ত ভারি মজাই হয়।

“দাদা, কি করে তার কাছে কথা পাড়ি বল দিকিন?”

“তা আমি শিখিয়ে দিচ্চি। একটু অবসর খুঁজে আড়ালে পেলে, তার হাতখানি এমনি করে ধরে, তাকে বলবে—“দেখ কুসুম,—আমি তোমায় ভালবাসি। একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি, তুমি আমায় ভালবাস কি?” যদি বলে “বাসি” তাহলে জিজ্ঞাসা করবে—“তুমি আমার হবে কি—আমায় বিয়ে করবে কি?” যদি সে অনুকূল উত্তর দেয়—তাহলে তার হাতটি এই রকম করে ঠোঁটে তুলে চুমো খাবে।”

মাণিক বলিল—“কিন্তু দাদা, যদি সে রাজি না হয়?”

প্রভাস বলিল—“তা প্রথম বারেই রাজি নাও হতে পারে। ও রকম অনেক কেতাবে পড়া গেছে। প্রথম বারে কেউ কেউ একেবারেই ‘না’ বলে। কেউ কেউ বা বলে—‘ভারি সহসা বলেছ, সময়ে উত্তর পাবে।’ যে রকম হয়,—তখন আবার তোমায় শিখিয়ে দেব।”

চাঁদ উঠিয়াছিল। দুইজনে নানা জল্পনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিন হইতে মাণিকলাল অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েক দিন চেষ্টার পর তাহা লাভও করিল। এক দিন সকালে তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই, কুসুম রান্নাঘরের বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে।

মাণিক বলিল—"কুসুম, বাগানে যাবে? তোমায় আম পেড়ে দিইগে চল।"

কাঁচা আমের নামে কুসুমের জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিল—"চল না মাণিক দাদা।"

বাগানে প্রবেশ করিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, মাণিক বলিল "আমি ভারি ফুল ভালবাসি।"

কুসুম বলিল—"খবদ্দার খবদ্দার—ফুল তুলো না,—ফুল তুল্লে দিদিমা যে বকে!"

মাণিক বলিল—"না, তুলছিনে। শুধু ফুল ভালবাসি তাই বলছি। ফুলকে ভাল কথায় কি বলে জান?"

কুসুম মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"আহা কে না জানে!—পুষ্প। আমাদের পদ্যপাঠে রয়েছে—

শাখীশাখে পুষ্পগুলি কিবা মনোহর।
পাখী ডাকে সুধা ঢালে শ্রবণ ভিতর॥

আচ্ছা মাণিক দা, তুমি ত ইংরাজী পড়, শাখী মানে কি বল দিকিনি।"

কুসুমের চক্ষু দুইটি মাণিকের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। মাণিক বলিল—"পুষ্প ছাড়া, ফুলের আর কি নাম হয়?"

"আহা, তুমি আগে আমার কথার উত্তর দাও না মশাই। শাখী মানে কি ?"

"শাখী মানে বৃক্ষ।"

"জানে রে!" বলিয়া কুসুম হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল।

মাণিক বলিল—"এখন বল, পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়।"

"আর কি নাম ? দাঁড়াও ভাবি।" বলিয়া কুসুম ঠোঁট নাড়িয়া বিজ্ বিজ্ করিয়া কি বকিতে লাগিল। বোধ হয় কোনও কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল।

মাণিক বলিল—"কু—"

কুসুম বলিল—"কু ? কু কি ?

কুহু কুহু রব করি ডাকিছে কোকিল,

কুসুম——

ওহো মনে পড়েছে। ফুলের আর একটা নাম কুসুম গো কুসুম।

কুসুম দুলায়ে ধীরে বহিছে অনিল।

আচ্ছা মাণিকদাদা, অনিল মানে যদি বল্‌তে পার, তবে ত বুঝি।"

মাণিক বলিল, "অনিল মানে বাতাস।"

বালিকার চক্ষে একটা আনন্দ ও প্রশংসার আলোক দেখা দিল।

মাণিক যথাশিক্ষা কুসুমের হাতখানি ধরিল। ধরিয়া বলিল—"বুঝতে পারলে না ? আমি ফুল ভালবাসি বলেছি তার মানে

আমি কুসুম ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি কুসুম। তুমি আমায় ভালবাস ?”

কুসুম দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, “হ্যাঁঃ”।

মাণিক বলিল—“দেখ কুসুম, অনেক দিন থেকে একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি। তুমি আমায় বিয়ে করবে ?”

প্রথম কথাটার মানে কুসুম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথাটার মানে বুঝিল। কিন্তু ঐ কথাতেই সব মাটী হইয়া গেল।—“ধেৎ”—বলিয়া মাণিকের হাত ছাড়াইয়া কুসুম ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

তাহার পায়ের মল ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মাণিক ততক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কুসুম চক্ষুর অন্তরাল হইলে, মাণিক ব্যাপারটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। বিবাহের নামে কুসুম অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইল তাহার অর্থ কি ? তবে কি কুসুম সম্মত নয় ?

অধীত উপন্যাসগুলি মাণিক একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে মনে একটা মীমাংসাও পাইল। লজ্জা প্রণয়ের চির-সহচর। কুসুমের পলায়নের কারণ যে লজ্জা, তাহার আর কোনও সংশয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রভাস শুনিয়া বলিল—তবে আর কোনও চিন্তা নাই। ভালবাসে যখন স্বীকার করিয়াছে তখন বিবাহে সম্মতি ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে। এখন উভয় পক্ষের পিতামাতার সম্মতি

করাইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি। মাণিক বলিল—"বাবাকে তুমি বল্লে বাবা রাজি হবেন ত?"

প্রভাস বলিল—"দেখ, তার চেয়ে তুমিই বল। আমার বলাটা তত ভাল দেখায় না। হাজার হোক তোমার বাবা,—আমার মামা বই ত নয়! বাবায় মামায় ঢের তফাৎ।"

মাণিক বলিল—"সে আমি পারব না। তুমি গোড়া থেকে বল্লে তুমিই প্রস্তাবটা করবে, এখন পিছুচ্চ কেন?"

প্রভাস প্রথমটা মাণিককে যে পরিমাণ উৎসাহ দিয়াছিল, কার্য্যকালে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। মাণিকের পিতা নন্দলাল বাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা পাড়ায় বিলক্ষণ সাহসের প্রয়োজন।

এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে সপ্তাহ খানেক কাটিল। মাণিক ও প্রভাস যখনই নির্জ্জনে থাকিত,—তখন আর দুজনের অন্য কথা নাই। পূর্ব্বে দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্য গোছের যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল, এখন তাহা ঘুচিয়া সখ্যে দাঁড়াইয়াছে।

একদিন মাণিক, কুসুমের নামে একটা মস্ত কবিতা লিখিল। প্রভাস তাহা পড়িয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বলিল—স্বয়ং অনুভব করিয়া কবিতা না লিখিলে কি আর কবিতা! বলিল, ইহা কুসুমকে নিশ্চয়ই দেখান উচিত।

উত্তম চিঠির কাগজে, নীল কালীর বর্ডার টানিয়া, লাল কালী দিয়া মাণিক কবিতাটি নকল করিল। তাহার পর আবার অবসর খুঁজিয়া, কুসুমের সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিল।

কুসুম কবিতা লইয়া পড়িল। কি বুঝিল তাহা সেই জানে। মাণিক বলিল—"কুসুম, তুমি এটি রাখবে?"

কুসুম বলিল—"রাখব বৈ কি।"

মাণিক কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—"কারুকে দেখাবে না ত কুসুম?"

কুসুম প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"কারুথুকে নয়।"

"খুব লুকিয়ে নিয়ে যেও। কোথায় রাখবে?"

"কেন আমার বাক্সে।"

মাণিক নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

ওদিকে পরম সত্যবাদিনী কুসুম বাড়ী গিয়াই বলিল—"দিদি একটা কথা বলি শোন্।"

তাহার দিদির নাম নলিনী। সে ষোল বৎসরের, বিবাহিতা; স্বামীর প্রেমে ভরপূর—মনের সুখে হাস্য কৌতুকময়ী।

দিদি আসিলে কুসুম বলিল—"মেজদি, একটা মজা দেখবি?"

"কি?"

কুসুম খামখানি বাহির করিয়া বলিল—"কারুকে বলবিনে?"

"কার চিঠি লা?" বলিয়া নলিনী ছোঁ মারিয়া খাম কাড়িয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।"

পড়িয়া নলিনী অবাক। পাতা উল্টাইয়া নাম খুঁজিল।

কোনও নাম নাই। জিজ্ঞাসা করিল—"এ কোথা পেলি ?"

"মাণিক দাদা দিয়েছে।"

"কে ? ম্যান্‌কা ?"

"হ্যাঁ।"

নলিনী গালে হাত দিয়া বলিল—"ওমা কি হবে! তোকে এ সব লিখেছে কেন ?"

কুসুম ভীত হইয়া বলিল—"তা কি জানি!"

"এ যে ভালবাসার কবিতা। তোদের ভালবাসা হয়েছে নাকি লো!"

কুসুম বলিল—"ম্যান্‌কা আমায় একদিন বলছিল আমি তোকে ভালবাসি।"

নলিনী বলিল—"আহা তা বেশ! ছেলেটি! পছন্দ ভাল।" বলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল :—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
দিবা রজনী
তব মুখ খানি
মনে লই।"

পড়িয়া নলিনী হাসিয়া কুটি কুটি। বলিল, "দুনিয়ায় আর মিল খুঁজে পেলে না, শেষে লিখলে কি না 'মনে লই'। তার চেয়ে 'চিঁড়ে দই' লিখলে ঢের বেশী সরস হত। কি বলিস কুসমি ? শোন দিকিন—

কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখ খানি,
দিবা রজনী
চিঁড়ে দই।

অর্থাৎ কিনা চিঁড়ে দই দেখলে কারু কারু যেমন খাবার লোভ হয়, তোমার মুখখানি দেখলে,—আমারও সেই রকম—লোভ হয়।”—বলিয়া নলিনী খুব হাসিতে লাগিল।

হাসির শব্দে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—“অত হাস্‌ছিস কেন তোরা ? হয়েছে কি ?”

নলিনী মার হাতে চিঠি দিয়া বলিল—“এই নাও মা, তোমার ছোট জামাই তোমার মেয়েকে কি লিখেছে দেখ।”

মা লেখার পানে চাহিয়া বলিলেন—“কথার ছিরি দেখ না ! কি বলিস্ তার ঠিক নেই। কি এ ?”

নলিনী মার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—“ভালবাসার চিঠি। এত বড় মেয়ে হলো, বিয়ে দিচ্ছ না,—তা মেয়ে নিজের বর নিজে ঠিক করে নিয়েছে।”

মা ত অবাক্। বলিলেন—“কে লিখিছে এ সব ?”

“সে পরে বলব। আগে শোনই না।” বলিয়া মার হাত হইতে কবিতা লইয়া নলিনী পড়িতে আরম্ভ করিল :—

“কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।

তব মুখ খানি
দিবা রজনী
মনে লই।
শয়নে স্বপনে
কিম্বা জাগরণে
সদা সর্ব্বদা
চিন্তা করি তোমা
রূপ নিরূপমা
ওগো প্রেমদা।
ভাবিয়া ভাবিয়া
নিদ্রা তেয়াগিয়া
ফেলি অশ্রুজল।
যথা শুষ্ক তরু
হনু এবে সরু
দেহ টলমল।——"

মা বাধা দিলেন। বলিলেন—"কি পাগলামি করছিস, রঙ্গ ভাল লাগে না। কে লিখেছে বল না।"

"চৌধুরীদের ম্যানকা লিখেছে।"

"ম্যান্‌কা? আরে গেল যা! কি দস্যি ছেলে গো! এ কি বিপ্তে!" বলিয়া মা কুসুমকে খুঁজিতে লাগিলেন।—"কুস্‌মি, কুস্‌মি, কুস্‌মি কোথা গেল?"

কুসুম গোলযোগ দেখিয়া পূর্ব্বেই চম্পট দিয়াছিল।

ক্রুদ্ধা জননী বাহির হইয়া কুসুমকে গেরেপ্তার করিলেন। বলিলেন "এ কিরে সতেক্‌খোয়ারী?"

কুসুম গোঁ হইয়া বলিল—"আমি কি জানি!"

"তুই জানিস্‌নে ত কে জানে আবাগী!—খেয়ে খেয়ে দিন-কের দিন হাতী হচ্চেন—আর এই সব বিস্তে হচ্চে। কি হয়েছে বল।"

কুসুম বলিল—"হতভাগা লক্ষিছাড়া ম্যান্‌কা আমায় দিলে ত আমি কি করব?—আমার বুঝি দোষ, বা রে!"

"কি বলেছে দেবার সময় তোকে?"

"বলেছে মাকে কি কাউকে দেখাসনে—বাক্সতে লুকিয়ে রাখিস।"

মা তখন কুসুমকে অনেক জেরা করিলেন। জেরার শেষে কুসুম বলিল—

"একদিন বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যান্‌কা আমায় বল্লে কি, তোকে আমি আম পেড়ে দেব তুই আমায় বিয়ে করবি? দূর পোড়ারমুখো বলে আমি পালিয়ে এলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রাগের মধ্যেও মার ওষ্ঠের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। শেষে তিনি বলিলেন—

"শোন বলছি,—ফের যদি ম্যানকার ত্রি-সীমানায় যাবি, কি ওর সঙ্গে কথা কবি কি খেলা করবি,—তা হলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব। বুঝেছিস্‌?"

কুসুম খালি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "বা রে! আমি কি করব,—আমায় দিলে কেন?"

মা তখন সে কবিতা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া উনানে ফেলিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন—যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনো মসৃণ হয় নাই। যে ভাল বাসিয়াছে, সেই কাঁদিয়াছে। প্রেম যে 'কেবলি যাতনাময়', তাহাতে যে 'কেবলি চোখের জল' এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

কুসুম ত বকুনি খাইয়াই নিস্তার পাইল, মাণিকলালের অদৃষ্টে আরও দুর্গতি লেখা ছিল।

মাণিকের পিতা নন্দ চৌধুরী গ্রামের ডাক্তার,—খুব পশার। প্রাতে রোগী দেখিতে বাহির হন, যখন বাড়ী আসেন তখন প্রায় বারোটা। স্নানাহার করিয়া নিদ্রা যান।

সুতরাং প্রভাস ও মাণিক পরামর্শ করিল, বৈকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর প্রভাস গিয়া কথাটা পাড়িবে।

দুই জনে বাহিরের ঘরে বসিয়া,—প্রতীক্ষা করিতেছে। একটা প্রবল আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় দুই জনের মুখই কালিমাময়।

শেষ চারিটা বাজিল। শব্দ শোনা গেল, বিছানা হইতে নন্দ চৌধুরী হাঁকিলেন—"ওরে বুনো,—তামাক নিয়ে আয়।"

আরও কয়েক মিনিট গেল। তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাস গিয়া মামা বাবুর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

নন্দ চৌধুরী বিছানার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছেন। নিদ্রা ভঙ্গে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চৌকিতে গুড়গুড়ি রক্ষিত। ধূমপান করিতেছেন।

প্রভাস প্রবেশ করিয়া, বিছানার কাছে একটা চেয়ার ছিল

তাহাতে বসিল। নন্দ চৌধুরী বলিলেন—"কি প্রভাস!"—তাঁহার স্বর বৈকালিক নিদ্রায় শ্লেষ্মাজড়িত।

প্রভাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—"আজ্ঞা একটা কথা আজ আপনাকে বলব মনে করেছি।"

নন্দ চৌধুরী উৎসুক হইয়া, গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে খুলিয়া, প্রভাসের পানে চাহিয়া অস্ফুটভাবে বলিলেন—"কি?"

প্রভাসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল—কেন আসিলাম,—কেন এ জালে নিজেকে জড়াইলাম। কিন্তু আরম্ভ যখন করিয়াছে, আসরে যখন নামিয়াছে, তখন শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে।

সুতরাং বাক্য স্ফুরণ করিতে বাধ্য হইল। বলিল—"আমাদের মাণিকের জন্যে ভারি চিন্তিত হতে হয়েছে।"

"কেন? কি হয়েছে? কোনও ব্যারাম স্যারাম না কি?" ডাক্তার মানুষ, ব্যাধির কথাটাই প্রথমে মনে হয়। প্রভাস বলিল "আজ্ঞে, শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক বটে।"

চৌধুরী গুড়গুড়ির নল পুনরায় মুখে লইয়া বলিলেন—"কি রকম।"

"ও একটি মেয়ের সঙ্গে loveএ পড়েছে।"

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে একেবারে বিছানায় ফেলিয়া নন্দ চৌধুরী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"কি বল্লে?"

প্রভাস তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া বিপদ্ গণিল, বলিল—"আজ্ঞা, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে।"

"প্রণয় হয়েছে? সে আবার কি রকম? ব্যাপার খানা কি? কার সঙ্গে প্রণয় হয়েছে?"

"আজ্ঞে অতুল বাঁড়ুয্যের যে কুসুমলতা বলে একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গে ও লভে পড়েছে। তাই আপনাকে বলতে এসেছি যদি ওর জীবনের সুখ চান তবে কুসুমের সঙ্গে ওর বিবাহ দিন।"

নন্দ চৌধুরী শুনিয়া গম্ভীর হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, স্বর একটু নামাইয়া, বলিলেন—"কি রকম করে লবে পড়ল?"

প্রভাস মনে মনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। ভাবিল, তবে সন্তানের দুঃখে পিতার মন গলিয়াছে। বলিল—"আজ্ঞা, কি রকম করে পড়ল তা বলা বড় কঠিন,—তবে এ পর্য্যন্ত বলতে পারি যে আকর্ষণটা উভয়তঃ।"

চৌধুরী বলিলেন—"উভয়তঃ—বটে!" বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিয়ে করতে চায়?"

মাথা নীচু করিয়া, ধীরে ধীরে প্রভাস বলিল—"আজ্ঞা এই ত একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, তা হলে ওর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।"

চৌধুরী বলিলেন—"মরুভূমি? ওঃ!" বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। প্রভাস একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল—"প্রথম প্রণয় প্রায়ই ভারি গভীর হয়। তাকে বাধা দিতে যাওয়া অনেক সময় সর্ব্বনাশ।"

চৌধুরী বলিলেন—"ম্যানকাকে ড্যাক।"

প্রভাস উঠিয়া পড়িবার ঘরে গেল। দেখিল হাতে মুখ ঢাকা

দিয়া মাণিক শুইয়া আছে। একটু হাসি মুখে বলিল—"মাণিক যাও ভাই, মামা বাবু ডাকছেন।"

মাণিক বলিল—"কি রকম বুঝলে?"

"এ পর্য্যন্ত ত খুবই আশাপ্রদ। খুব সহৃদয় ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।"

মাণিকের কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সত্যই কি এত সৌভাগ্য তাহার হইবে? বলিল—"চল তবে।"

প্রভাস বলিল—"তুমি একা যাও। কারণ এ সময় কোনও তৃতীয় ব্যক্তির থাকাটা ঠিক নয়। বিষয়টা ভারি—কি বলে গিয়ে—ইয়ে কি না।"

মাণিক বলিল—"না ভাই তুমি এস,—নইলে আমার ভারি ভয় করবে।"

প্রভাস বলিল—"আচ্ছা, মিনিট দশ পরে আমি যাচ্ছি,"—বলিয়া মাণিককে ঠেলিয়া দিল।

মাণিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা আর্সির কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁফ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাণিকের ছায়া আর্সিতে পড়িল।

নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর এগ্‌জামিন কবে?"

মাণিক বলিল—"আর বারো দিন আছে।"

"কি রকম তৈরি হল?"

"আজ্ঞা হয়েছে এক রকম।"

"পড়া শুনো করছিস বেশ মন দিয়ে? না খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস?"

"আজ্ঞে না, খেলা বেশী করিনে।"

"তবে কি করিস? সবে পড়েছিস না কি শুনলাম?"

মাণিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া বামহস্ত দিয়া মাণিকের দক্ষিণ শ্রবণেন্দ্রিয়টি ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন—"উত্তর দিচ্চিস নে যে?"

মাণিক কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কথা বাহির হইল না।

তাহার পিতার রক্ত চক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল।

ঘূর্ণায়মান চক্ষু স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"হুঁ, পিড্ শুয়োর,—আজ বাদে কাল এগ্জামিন,—লেখা গেল পড়া গেল, সব্ হচ্চে?"

বলিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহার গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় ধরাইয়া দিলেন।

প্রভাস এই সময় দুয়ারের কাছ বরাবর আসিয়াছিল। চড়ের শব্দ শুনিয়া সে অবিলম্বে চম্পট দিল।

মাণিক দুই হাতে মুখ ও চক্ষু ঢাকিয়া অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নন্দ চৌধুরী তখন বালককে ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন—"এ কদিন দিবেরাত্তির কেবল প্রভাসের সঙ্গে গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ হচ্চেই হচ্চেই,—আমি ভাবি ব্যাপারটা কি,—এরা কুইনের রাজ্য নেবারই মৎলব করেছে—

না কি করেছে! হতভাগা পাজি নচ্ছার হনুমান! নবে পড়া হয়েছে! মরুভূমি হয়ে যাবে! এত কথা শিখলে কোথা তাই ভাবি। আমরা বুড়ো হয়ে মরতে চল্লাম এত কথা ত জানিনে! পড়া শুনোর নাম নেই! খাবি কি এর পরে? আমি এই সারা দুপুর রোদ্দুরটা মাথায় করে রুগীর নাড়ী টিপে বেড়াচ্ছি, দুটো পয়সার জন্যে মুখে রক্ত উঠে মরছি—যত দিন বেঁচে আছি ততদিন মন দিয়ে পড়ে শুনে নিজের কায কিনে নে,—তা নয় নবে পড়েছেন ছেলে আমার! আর প্রভাসটা যে কলেজে লেখা পড়া শিখে এত বড় বাঁদর হয়েছে তা ত জানতাম না। ওকালৎ নামা নিয়ে এসেছে! আরে গেল যা!—ফের যদি ওসব পাগলামি শুনতে পাই ত জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে দেব।"

অতঃপর মাণিক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

* * * *

ডাক্তার বাবুর চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও অতি সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খাইল যে পরদিন তাহার অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে সপ্তাহ খানেক স্কুলে গেল না। প্রভাস চলিয়া গিয়াছিল। প্রেমিকের আদর্শে খর্ব্বতার জন্য মাণিকের কাহারও নিকট জবাবদিহি করিবারও রহিল না। তাই অসুখ দুই দিনেই ভাল হইলে,—বাকী দিনগুলির অধিকাংশ মাণিক বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া অতিবাহিত করিল।

ছদ্মনাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রেসের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া ছুটির পূর্ব্বেই পূজার "বঙ্গ-প্রভা" বাহির করিয়া ফেলিলাম। ডেস্প্যাচ সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষকে উপদেশ দিতেছি, হ্যাট্‌কোট পরিয়া সিগারেট মুখে করিয়া সতীশ আসিয়া উপস্থিত। বলিল—"দার্জ্জিলিং চল।"

সতীশ আমার বাল্য-বন্ধু। আমরা এক ক্লাশে পড়িতাম, একত্র বসিতাম, একত্র বেড়াইতাম,—পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে বলিতেন কানাই বলাই।

এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া দুই জনে কলিকাতায় কলেজে আসিলাম—তখন হইতে আমাদের দুই জনের জীবনের আদর্শ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সতীশ সর্ব্ববিষয়ে সাহেব হইয়া উঠিতে লাগিল;—আমি আমার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগশালী হইলাম। আমি বাঙ্গলা পড়ি, বাঙ্গলা লিখি বলিয়া সতীশ আমাকে বিদ্রূপ করিত; সতীশের সাহেবিয়ানাকে আমি সুযোগ পাইলেই গালি দিতাম।

তার পর সতীশ বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিল,—সাহেবিয়ানার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিল।

আমরা বাল্যকালে যেরূপ এক প্রাণ এক আত্মা ছিলাম, এখন আর সেরূপ নাই। সতীশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সতীশ আমাকে হয়ত তাহার সকল মনের কথা আর বলে না। তথাপি আমরা পরস্পরের পরম বন্ধুই আছি।—সতীশ বলিল—"দার্জ্জিলিং চল"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে যাচ্চ?"

সে বলিল—"আজ"

আমি বলিলাম—"পাগল! আজ সময় কোথা?" সতীশ ঘড়ি খুলিয়া দন্তে চুরোটিকা দংশন করিয়া বলিল—"মোটে দশটা বেজেছে। চারটের সময় ট্রেণ। ছ ঘণ্টা। তিনশো ষাট মিনিট। রাশি রাশি সময়।"

আমি বলিলাম—"সাহেব অনুগ্রহ করে যদি বাঙ্গলাই বলছ, তবে খাঁটি বাঙ্গলাটাই বল। ইংরেজি থেকে তর্জ্জমা করে বোলো না। 'রাশি রাশি সময়' কি রকম বাঙ্গলা হল!"

সতীশ অধীর হইয়া বলিল—"হ্যাং ইওর বাঙ্গলা। যাবে কি না বল।"

আমি বলিলাম—"ভাই, তুমি সায়েব হয়েছ,—তোমারা যত চট্ পট্ সব কায করতে পার, আমরা কালা আদমি কি তা পারি? স্নান করতে খেতে বারোটা বেজে যাবে। তার পর একটু বিশ্রাম—"

সতীশ বলিল—"নন্‌সেন্স্, ওসব ওজর রেখে দাও।"

আমি বলিলাম—"তা দার্জ্জিলিং যদি যাবারই ইচ্ছে, তবে দুদিন আগে বল্লে না কেন?"

"আজ সকালে মাত্র দার্জ্জিলিং থেকে ডাক্তার সেনের নিমন্ত্রণ পেলাম।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"কি! ডাক্তার সেন দার্জ্জিলিঙে? সপরিবারে? সকন্যা?"

সতীশ বলিল—"অবিশ্যি।" বলিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল।

ডাক্তার সেনের বিদুষী কন্যা নির্ম্মলা আমার বন্ধুরত্নের মনোহরণ করিয়াছেন ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য।

আমি বলিলাম—"কি ভয়ানক! চারটে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? তার আগে গাড়ী নেই?"

সতীশও অভিনেতার মত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"না"।

আমি গান ধরিলাম—

"এমনে কেমনে রব, না হেরে তাহায় রে,—
গণিয়ে নিমেষ পল, দিন না ফুরায় রে!"

যদিও নিজে কখনো রমণীর প্রেমে পড়ি নাই, তথাপি ব্যাপারটা জানা আছে। সতীশকে একদিন দেরী করিতে বলাও যা আর ব্যাঘ্রকে অহিংসাধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টাও তাহাই। সুতরাং যাইবই স্থির করিলাম। জিনিষ পত্র গুছাইয়া চারিটার গাড়ীতে দুইজনে যাত্রা করা গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দার্জ্জিলিঙের ষ্টেসনে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই কিছুদূর হইতে দেখা গেল, ডাক্তার সেন স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে জুতা মোজা পরিয়া প্রকাশ্যভাবে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াই আমার পিত্ত জ্বলিয়া

গেল। ব্রাহ্মমহিলা আমি এজীবনে অনেক দেখিয়াছি, দুই এক জনের সঙ্গে পরিচয়ও আছে, এরূপ আচরণ কিছুই নূতন নহে, তথাপি সতীশের ভাবী বধূ, ভাবী শ্বশ্রূ বলিয়াই নূতন করিয়া আঘাতটা লাগিল। আমি স্ত্রীশিক্ষার খুব পক্ষপাতী কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা জিনিসটা দুচক্ষে দেখিতে পারি না। আমার কাগজে সম্প্রতি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ভবিষ্যতে আরও লিখিবার উপকরণ তখনি তখনি মাথার ভিতর গজাইতে লাগিল। খুব কড়া কড়া চোখা চোখা বাক্যাবলী মস্তিষ্কের ভিতর শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু অল্পক্ষণেই তাহাদের ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

গাড়ী হইতে নামিয়াই সতীশ আমাকে সকলের কাছে "ইন্ট্রোডিয়ুস্" করিয়া দিল। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত, না জানা থাকায় আমি থতমত খাইয়া কোনও কথা বলিতে না পারিয়া মূঢ়ের মত প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্তে ফুলগাছের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সতীশটার লজ্জা সরম কিছুই নাই, নির্ম্মলার ভাইকে লগেজের সন্ধানে প্রেরণ করিয়া, নিজে নির্ম্মলার সঙ্গ জোঁকের মত ধরিয়া রহিল।

নির্ম্মলা একটু পরেই আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সহাস্যমুখে আমায় বলিল—"মন্মথ বাবু, আমি আপনার কাগজের একজন নিয়মিত পাঠিকা।" আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, বলিল না।

নির্ম্মলার মা বলিলেন—"পূজোর 'বঙ্গপ্রভা' কবে বেরোবে মন্মথ বাবু?"

আমি বলিলাম—"পূজোর বঙ্গপ্রভা? সে ত বেরিয়ে গেছে।"

মিসেস্ সেন কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"পেয়েছিস্ ?"

নির্ম্মলা বলিল—"কৈ না।"

আমি বলিলাম "না না, মাফ করবেন। এখনো আপনাদের পাবার সময় হয়নি। এই কাল মোটে বেরিয়েছে। মফস্বলে সব ডেস্প্যাচ্ একদিনে হয়ে ওঠে না কি না।"

নির্ম্মলা বলিল—"ওঃ—আমার বঙ্গপ্রভা প্রথমে ঢাকায় যাবে, তার পর ঠিকানা কেটে এখানে আসবে, তবে আমি পাব। আপনার কাছে একখানা নেই মন্মথ বাবু ?"

বঙ্গপ্রভার প্রতি নির্ম্মলার টান দেখিয়া আমার সম্পাদক-প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"হ্যাঁ আছে বৈকি। আপনাকে কালই এক কপি পাঠিয়ে দেব।"

নির্ম্মলা বলিল—"বেশী কষ্ট করবেন না, সুবিধে মত পাঠিয়ে দেবেন।"

নির্ম্মলার মা বলিলেন—"মন্মথ বাবু, কাল বিকেলে আমাদের বাড়ী চায়ে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, আসবেন।" বলিয়া সস্মিত অভিবাদনান্তর তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমিও স্যানিটেরিয়মের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ভাবিলাম শিক্ষা ও সংসর্গের এমনি গুণ, বাঙ্গালীর মেয়েও কথায় বার্ত্তায় এমন নিঃসঙ্কোচ হইতে পারে !

রাত্রে বিছানায় ক্লান্তদেহ রাখিয়া সমাজতত্ত্বের অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই যে নূতন শিক্ষার সঙ্গে নূতন আচার ব্যবহার আমরা ইউরোপ হইতে আমদানি করিতেছি, ইহার ভাবীফল কিরূপ দাঁড়াইবে ?—চিন্তা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে পূর্ব্বদিনের ঘটনা গুলি আলোচনা করিতে লাগিলাম। সমাজে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা আমি সামাজিক নীতির পক্ষে নিরাপদ মনে করি না। তাই ভাবিলাম চায়ের নিমন্ত্রণে যাইব না; নিজের বিশ্বাসবিরুদ্ধ কায করিব কেন? "বঙ্গপ্রভা" খানা চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিলেই চলিবে। আর হয় ত সতীশও এখনি আসিবে, তাহার হাতে পাঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

কিন্তু সতীশটা এমনি গর্দ্দভ, আসিল না। বোধ হয় নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিল না। মনে মনে উহাদের প্রেমলীলা কল্পনা করিয়া কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম।

আহারাদির পর মনে হইল, চায়ের নিমন্ত্রণ যদি রক্ষা না করি, তাহা হইলে ঠিক ভদ্রতা হয় না। নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করিয়াছি তখন রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। যদি বিশ্বাসবিরুদ্ধই হইল, তবে সেই সময়েই আমার উচিত ছিল,—নিমন্ত্রণ কাটাইয়া দেওয়া। আজিকার মত যাই অন্য সময়ে সাবধান হওয়া যাইবে;—আর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি না।

বৈকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বেশ-বিন্যাস একটু যত্নপূর্ব্বকই করিলাম। নিজেকে বুঝাইলাম, শুধু পুরুষ সমাজে বিচরণ করিতে হইলে বেশভূষার তারতম্যে আসিয়া যায় না;—কিন্তু রমণী সমাজে একটু পরিপাট্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

দার্জ্জিলিঙ আমি বহুবার আসিয়াছি;—পথ ঘাট আমার

সর্ব্বত্র পরিচিত। যখন বাড়ীর কাছে পৌছিলাম, তখন চারিটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে;—নিমন্ত্রণ চারিটার সময়। ভাবিলাম, ইহারা ইংরাজি ধরণের লোক, যথাসময়ের পূর্ব্বে যাইলে হয়ত বা বর্ব্বর মনে করিবে। তাই বাহিরে এদিক ওদিক একটু বেড়াইয়া, ঠিক চারিটার সময় কার্ড পাঠাইয়া দিলাম।

সকলেই আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। নির্ম্মলাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। ষ্টেশনে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার গায়ে ইংরেজি কেপ্, পায়ে ইংরাজি জুতা,—দেখিতে আমার মোটে ভাল লাগে নাই। এখন দেখিলাম, পায়ে লাল মখ্মলের দেশী জুতা, নারাঙ্গি রঙের শালের শাড়ীখানি নব্য প্রথায় পরা, মাথায় মাথাভরা চুলের এলো খোঁপা, এবং খোঁপায় একটি পীতবর্ণের পাহাড়ী গোলাপ। নির্ম্মলা খুব সুন্দরী বটে!

সতীশকে প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে, নির্ম্মলার লাল মখমলের জুতার উপর "রাঙা পা দুখানি" বলিয়া কেমন রসিকতা করিব তাহা মনে মনে সাধিয়া রাখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সতীশ আসিল। চা পান ও নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইলে পর সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাইবার পরামর্শ হইল।

যখন বিদায় লইলাম, তখন মিসেস্ সেন্ বলিলেন—"মন্মথ বাবু, কাল আবার যদি চায়ের সময় আসেন তবে একত্র বেড়াতে যাওয়া যায়।"

মনে হইল, এবার সময় হইয়াছে, এই বেলা নিমন্ত্রণ স্পষ্ট করিয়া অস্বীকার করি। সেই সঙ্গে অস্বীকার করিবার প্রকৃত কারণটাও খুলিয়া বলিব কি? তাহার ভিতর সমাজনীতিঘটিত কত বড় একটা উচ্চতত্ত্ব ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার এই অবসর গ্রহণ করা উচিত নয় কি? কিন্তু আবার ভাবিলাম, নিমন্ত্রণ কৈ? "যদি আসেন" ইহাকে কি নিমন্ত্রণ বলা যাইতে পারে? এইরূপ মানসিক তর্কে ব্যস্ত থাকায় কোনও উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলাম না; এদিকে ইহাঁরাও নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে বেলা দশটার সময় সতীশ আসিয়া উপস্থিত। নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিল জিজ্ঞাসা করায় বলিল —"তোমার সেই হতভাগা কাগজ বঙ্গদর্পণ না বঙ্গপ্রভা কি দিয়ে এসেছ, সকাল থেকে তাই নিয়ে ব্যস্ত। আমি রাগ করে চলে এলাম।"

শুনিয়া আমার মনটা ভারি খুসী হইল। সাহিত্যের প্রতি নির্ম্মলার এত অনুরাগ! নির্ম্মলা যদি বাঙ্গলা লেখেন তবে বঙ্গপ্রভায় সংশোধন করিয়া ছাপাই।

নির্ম্মলার অনেক গল্প সতীশ করিল। এই দুইটী নব প্রণয়ীর সুখে আমারও মনটা তারুণ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সতীশ বলিল—"এখন যাই। কেমন ঘর পেয়েছ দেখতে এসেছিলাম। চায়ের সময় দেখা হবে। আসছ ত?"

আমি বলিলাম—"চায়ে? আজ আর না। মিসেস্ সেন ত আজ আমায় নিমন্ত্রণ করেন নি।"

সতীশ বলিল—"করেছেন বৈ কি! আমি নিজে শুনেছি।"

"কোথা করেছেন? শুধু বলেছিলেন 'আসেন যদি'।"

"বিলক্ষণ! ঐ নিমন্ত্রণ হল। তবে কি তোমার দরজায় এসে গলায় বস্ত্র দিয়ে যথা শাস্ত্র নিমন্ত্রণ করে যেতে হবে না কি? আচ্ছা সেকেলে তুমি ত হে!"

আমি বলিলাম—"বল কি! কিন্তু আমি ত আজ যেতে পারছিনে। না গেলে কি ভয়ানক অভদ্রতা হবে? কি জানি তোমাদের সব বিলিতি এটিকেট্ ফেটিকেট্ জানিনে ভাই।"

সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল—"ভয়ানক অভদ্রতা হবে।"

শুনিয়া আমি নিজের প্রতি ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেই সময় মিসেস্ সেনকে অন্ততঃ এইটুকু বলিলেই হইত, 'না কাল আর আসতে পারব না, একটু কায আছে'—তা না করিয়া এটা রীতিমত নিমন্ত্রণ হইল কি হইল না সেই তর্কে ব্যস্ত রহিলাম; এখন এই অবস্থা।

সতীশ হাসিয়া বলিল—"না না, 'ভয়ানক অভদ্রতা' হবে না, অত চিন্তিত হোয়োনা। শুধু আবার দেখা হলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই চলবে কিন্তু আসবে না কেন? না না—এস।"

প্রকৃত কারণ সতীশকে একা বলিতে ততদূর উৎসাহ হইল না। আমি বলিলাম—"ওহে আজ একটু বিশেষ—"

সতীশ বলিল—"বিশেষ কায কাল হবে, আজ ত এস। অন্ততঃ আসতে চেষ্টা কোরো।" বলিয়া সে অন্তর্দ্ধান করিল।

আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম,—"যাই বল যাই কও, আর আমি যাচ্ছিনে।"

কিন্তু সময় যত অগ্রসর হইতে লাগিল, বড় একা অনুভব করিতে লাগিলাম। পূজার "বঙ্গপ্রভা" খানা নির্ম্মলার কেমন লাগিল জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্যও জন্মিল। বিশেষতঃ আমার স্বলিখিত সেই "নারীজীবনের আদর্শ" প্রবন্ধটা সম্বন্ধে।—নির্ম্মলার শ্রেণীর আজি কালিকার আলোকপ্রাপ্তা নারীগণের জন্যই সে প্রবন্ধটা লিখিয়াছি কি না। সে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নির্ম্মলার মতামত কিরূপ হইল তাহা জানা আবশ্যক।—সুতরাং যাওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গিয়া দেখিলাম, ড্রয়িং রুমে কেহ নাই। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছি, নির্ম্মলা আসিলেন, সহাস্যমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"কি সৌভাগ্য! আপনার আশা ত আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। বাবা, মা, সতীশ বাবু বাগান দেখতে গিয়েছেন। সতীশ বাবু বল্লেন আপনি আজ আর আসবেন না—ভারি ব্যস্ত আছেন। কোন নতুন লেখায় বুঝি?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, না—একটু কায ছিল, তা ভাবলাম—"

নির্ম্মলা বলিল—"আচ্ছা, বঙ্গপ্রভায় রোজ ক'ঘণ্টা করে আপনার সময় যায়?"

"আমার সমস্ত সময়ই প্রায় বঙ্গপ্রভায় যায়। আমি ত বঙ্গপ্রভা নিয়েই আছি।"

"বেশ আছেন। আমারও ইচ্ছে করে আমিও ঐ রকম সাহিত্য চর্চ্চা নিয়ে দিনরাত থাকি। কিন্তু আপনার কাছে এ মত ব্যক্ত করা বোধ হয় খুব দুঃসাহসের কায ?"

"কেন ?"

"আপনি 'নারীজীবনের আদর্শ' প্রবন্ধে যে সব মত এনেছেন ;—আপনার মতে, স্ত্রীলোকের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ ; নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে পরসেবায় যথার্থ নারীধর্ম্ম !"

"আপনি তা হলে প্রবন্ধটা পড়েছেন ?"

"পড়েছি বৈ কি ; সব পড়ে ফেলেছি। কাল রাত্রে বিছানায় পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি মোমবাতিটা শেষ অবধি পুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে, ঘরে ভয়ানক আলো হয়েছে, দেখে প্রথমটা এমন ভয় হয়েছিল !"

আমি বলিলাম—"ওঃ—ভাগ্যে কিছু ধরে টরে যায় নি।"

স্মিতমুখে নির্ম্মলা বলিলেন—"আপনার বঙ্গপ্রভা পড়তে গিয়ে যদি আমার মশারিতে আগুন ধরে যেত আমি পুড়ে যেতাম, তবে এই দুর্ঘটনা কাগজে কাগজে ছাপা হলে আপনার বঙ্গপ্রভার খুব একচোট বিজ্ঞাপন হয়ে যেত।"

ইহার উত্তরে প্রথমটা আমার কথা যোগাইল না—শুধু একটা উপমা মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল। যে মোমবাতি জ্বলার কথা বলিতেছেন এই সুশিক্ষিতা নারীটি তাহারই মত কি সুকোমল, অথচ তাহারই শিখার মত কি দীপ্তিমতী ? আমি

একটু অর্থশূন্য হাসি হাসিলাম শেষে বলিলাম—"বাঙ্গলা সাহিত্যে আপনার এত ভক্তি, বাঙ্গলা লেখেন না কেন ?"

"আমি লিখলে কে পড়বে ? প্রথমতঃ কে ছাপবে ?"

আমার খুব সন্দেহ হইল, নির্ম্মলা গোপনে গোপনে লিখিয়া থাকেন কিন্তু স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে ছোট গল্পের কথা উঠিল। আমি বলিলাম,—প্রতিমাসে একটা করিয়া ছোট গল্প দেওয়ার যে রীতি হইয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে ভাল গল্পাভাবে সম্পাদককে মুস্কিলে পড়িতে হয়।

নির্ম্মলা বলিলেন—"আমার একটি বন্ধু ছোট গল্প লেখেন। আমার কাছেই একটা রয়েছে। আপনি দেখবেন ?"

এ বিপদের সম্ভাবনা জানিলে ছোট গল্পের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিতাম না। সম্পাদকীয় ঘানি টানিতে টানিতে শিক্ষানবীশের অনেক গল্প আমাদিগকে পড়িতে হয়। কিন্তু এ এক মাস আমি ছুটী লইয়া পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছি।—তথাপি নিরুপায়। সুতরাং নির্ম্মলাকে বলিলাম—"তা দেবেন, দেখব।"

"দেখে আপনার যথার্থ মতামত আমায় বলতে হবে।"

"তা বলব।"

"আমার বন্ধু বলে কিছু রেখে ঢেকে বলবেন না ?"

"আপনি যদি যথার্থ মতই শোনবার জন্যে উৎসুক হন, তা হলে আমি যথার্থ মতই বলব।"

নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরে, রুল টানা ফুলস্ক্যাপে হাফ মার্জ্জিনে সুন্দর সাবধান হস্তাক্ষরে

লেখা, লাল রেশমে কোণ গাঁথা একটি পাণ্ডুলিপি আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া আমি বলিলাম—"নূতন লেখক ?"

নির্ম্মলা বলিলেন—"হ্যাঁ, কি করে জানলেন ?"

"নূতন লেখকেরা প্রায়ই বেশ ধরে ধরে যত্ন করে পাণ্ডুলিপি লিখে থাকেন। পুরোণো লেখকের হস্তাক্ষর প্রায়ই অস্পষ্ট হয়।"

এই কথা বলিয়া সম্পাদকীয় অভ্যাসবশতঃ শেষ পৃষ্ঠা উল্টাইয়া নাম খুঁজিলাম। নাম নাই। শেষ পৃষ্ঠাটায় চোক বুলাইয়া দেখিলাম নায়ক বা নায়িকা বিষ পান করিয়াছে কি না। নূতন লেখকের নায়কনায়িকা শেষটায় প্রায়ই বাঁচে না। দেখিলাম নায়কনায়িকা বাঁচিয়াই আছে ;—অনেকটা ভরসা হইল।

সন্দেহ হইল, এ লেখা হয় ত বা নির্ম্মলার নিজেরই। অনেক লাজুক লেখক প্রথম প্রথম অন্যকে নিজের লেখা দেখাইবার সময় বন্ধুর লেখা বলিয়া থাকেন।

নির্ম্মলাকে বলিলাম—"আজ আমি বাসায় গিয়ে এ লেখা পড়ব, কাল এসে আপনাকে মতামত বলব।"

লেখা নির্ম্মলার হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। মতামত কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিব তাহা আগে হইতেই জানা আছে। বন্ধুত্বের স্থলে নূতন লেখকের লেখার সমালোচনা শতসহস্রবার করিতে হইয়াছে। বাঁধি গৎ আছে,—সেইগুলি গুছাইয়া বলা মাত্র। "স্থানে স্থানে বেশ হৃদয়গ্রাহী"—"চর্চ্চা রাখিলে ক্রমে একজন ভাল লেখক হইতে পারেন"—ইত্যাদি।

ক্রমে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। চা পানাদির পর বাড়ীতে

বসিয়াই গল্প চলিতে লাগিল;—বেড়াইতে যাওয়া আর হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী গিয়া গল্প পড়িলাম। দেখিলাম খুব ভুল করিয়াছি। প্রথমতঃ নূতন লেখকের রচনা নহে;—হাত বেশ পাকা;—ভাষা তেজস্বী অথচ সংযত। দ্বিতীয়তঃ নির্ম্মলার লেখা নহে। এতকাল বৃথায় সম্পাদকতা করিতেছি না;—কাহার লেখা তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। গৌরীকান্ত রায়ের লেখা। সাক্ষাৎ আলাপ নাই,—শুনিয়াছি ঢাকার ঐ দিকেই কোথায় থাকেন। লেখা তাঁহার অনেক পড়িয়াছি। তিনি নব্য লেখকগণের মধ্যে একজন প্রধান, তবে লেখার অনেক দোষও আছে;—সে সব অল্প বয়সের দোষ। ক্রমে শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন নির্ম্মলার কাছে গিয়া লেখাটির সুখ্যাতি করিলাম। দুই এক স্থলে দোষও দেখাইলাম,—কিন্তু প্রশংসার ভাগই বেশী দিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"লেখকের বয়স কি অল্প?"

নির্ম্মলা বলিলেন—"হ্যাঁ,—আমার চেয়ে কিছু বড়।"

"আপনার খুব বন্ধু বুঝি?"

"হ্যাঁ, আমার একজন বিশেষ বন্ধু।"

কথাটা শুনিতে আমার ভাল লাগিল না। একজন যুবতী কন্যার একজন যুবক 'বিশেষ বন্ধু' থাকিবে কেন?

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এঁর লেখা দুই একটা আমরা পেতে পারিনে?"

নির্ম্মলা বলিলেন—"কেন,—আপনার খুব লোভ হচ্চে না কি?"

"তা হচ্চে।"

"আচ্ছা তা হলে আপনাকে একটা দেওয়াতে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা নয়।"

"আপনার কাছে তাঁর কি অনেক লেখা আছে?"

"তাঁর অনেক লেখাই আমার কাছে আছে। তিনি নূতন লেখা শেষ হওয়া মাত্র আমাকে পাঠিয়ে দেন!"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, গতিক ভাল নয়। এত অন্তরঙ্গতা!

বলিলাম—"আপনিই তাহলে তাঁর প্রধানা পাঠিকা?"

"অন্ততঃ প্রথমা বটে। আমিই বোধ হয় তাঁর লেখার সব চেয়ে বেশী ভক্ত।"

আমি তখন বলিলাম—"তাঁর নামটা শুনতে পাইনে?"

নির্ম্মলা একটু ভাবিলেন; শেষে বলিলেন—"গৌরীকান্ত রায়।" বলিতে তাঁহার কপোলদেশ কিঞ্চিৎ রক্তাভ হইল।

সতীশের জন্য আমার দুঃখ হইল।

তাহার পর গৌরীকান্তের প্রকাশিত লেখার সম্বন্ধে আমরা কথা কহিতে লাগিলাম।—আমি বলিলাম তাঁহার নব প্রকাশিত "নন্দরাণী" উপন্যাস আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

ইহার পর দুই তিন দিন নির্ম্মলার সঙ্গে গৌরীকান্ত রায়ের লেখার বিষয় অনেক আলোচনা করিলাম। নির্ম্মলা গৌরী-

কান্তকে একেবারে পূজা করেন বলিলেই হয়। লোকটার উপর আমার কেমন একটা বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সতীশ এখনও সেন-দম্পতির নিকট নির্ম্মলার পাণি প্রার্থনা করে নাই। করিলে মঞ্জুর হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস, সতীশ যেরূপ ডাক্তার সেনের জামাতৃ-পদাকাঙ্ক্ষী,—ডাক্তার সেনও সেইরূপ সতীশের শ্বশুরত্বের জন্ত সমুৎসুক। এ কয়দিনের ভাব গতিক দেখিয়া ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয়।

কিন্তু ঐ গৌরীকান্তবিভ্রাট আমায় দুশ্চিন্তান্বিত করিয়াছে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে "পরম বন্ধুত্ব" আমি মোটে বুঝিতে পারি না।

এখন ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। সতীশ ও নির্ম্মলার বিবাহ হইল? নির্ম্মলা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগশালিনী। সতীশ বাঙ্গলা সাহিত্যের নামে জ্বলিয়া যায়। এদিকে গৌরীকান্ত একজন প্রতিভাশালী লেখক, সে পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির মধ্যে বাছিয়া নির্ম্মলাকেই তাহার সাহিত্য-সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে। আর নির্ম্মলার মনও গৌরীকান্তের প্রতি একটা ভাবাবেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একটা অজ্ঞাত বীজস্বরূপ;—ইহা হইতে ভবিষ্যতে কি জাতীয় তরু উদ্গত হইতে পারে তাহা কে জানে?

আমি ইহা হইতে দিব না। আমি আমার বন্ধুর দাম্পত্য-

আমি বলিলাম—"তুমি!" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইলাম। চাকর আসিলে টেলিগ্রাম করিবার কাগজ আনিতে হুকুম দিলাম।

সতীশ বলিল—বিলাতে থাকিতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া সমস্ত ভাল বাঙ্গালা বহি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিল। পরে লেখা অভ্যাস করিয়াছে। তাহার প্রথম উপন্যাস "নন্দ-রাণীর" সমালোচনা বঙ্গপ্রভায় বাহির হওয়া অবধি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার কারণ আগে জানিলে পাছে আমি তাহাকে অন্যায় প্রশংসায় বাড়াইয়া তুলি।

চাকর টেলিগ্রামের ফর্ম্ম আনিল। ম্যানেজারকে সংবাদ পাঠাইলাম—নন্দরাণীর সমালোচনার অর্ডারপ্রুফ্‌ ডাকে দিয়াছি,—কিন্তু যেন ছাপা না হয়। তাহার স্থানে অন্য একটা প্রবন্ধ দিতে বলিয়া দিলাম।

বাস্তুসাপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈঠকখানার ঘড়িতে চারিটা বাজিবামাত্র দিদিমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিছানার উপর বসিয়া বলিলেন "দুর্গা দুর্গা দুর্গা।" পাশে বিধবা নাতিনী সুরবালা ঘুমাইতেছে, তাহাকে ডাকিলেন "সুরি, ও সুরি, ওঠ, আজ যে অমাবস্যা।"

জ্যৈষ্ঠমাস, সারারাত্রি খুব গ্রীষ্ম গিয়াছিল। এখন খোলা জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। সুরবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু দিদিমা আর অপেক্ষা করিতে পারেন না; সূর্য্যোদয় হইয়া গেলে আর গঙ্গাস্নানের পূর্ণফল হইবে না। তাই আবার ডাকিলেন—"সুরি, ও সুরি।"

সুরবালা উঠিয়া বলিল—"ওমা তাইত, ভোর হয়েছে যে।" দিদিমা বলিলেন—"সব জিনিষপত্তর গোছান আছে, চল্, শীগ্গির বেরিয়ে পড়ি।"

কাপড়, গামছা, নামাবলী ইত্যাদি লইয়া দুইজনে বাহির হইলেন। তখন অল্প আলো হইয়াছে। উঠানে নামিয়া দিদিমা অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; সুরবালা তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

খিড়কী দরজার কাছে যে আতাগাছ আছে, তাহার নিকটে

আসিয়াই দিদিমা "ওগো মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সুরবালা সভয়ে বলিল—"কি দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন—"হায় হায় হায়, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

সুরবালা বলিল—"কি! কি হয়েছে দিদিমা?"

দিদিমা অঙ্গুলি দিয়া আতাগাছের তলা দেখাইয়া দিলেন। ভয়ে ভয়ে নিকটে সরিয়া গিয়া সুরবালা দেখিল, একটি ছোট মোটা কালো সাপ রক্তাক্তকলেবরে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সুরবালা বলিল—"হ্যাঁ দিদিমা, বাস্তু?"

দিদিমা বলিলেন—"বাস্তু বৈ কি? দেখ্‌ছিস নে? আহাহা! এমন কায কে করলে! বাবা, কে তোমায় এমন করে বধ করলে! এ দুর্ম্মতি কার হল!"

দিদিমার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গঙ্গাস্নানে যাওয়া আর হইল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাতের মালা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

দিদিমার ভাবগতিক দেখিয়া সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"কি হবে দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন—"হবে আর কি—আমার মাথা হবে! ভিটেয় ব্রহ্মহত্যে হল। এ বংশ কি আর থাকবে? নির্ব্বংশ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে, লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে কোথায় দাঁড়াব হে নারায়ণ! হে মধুসূদন! হায় হায় হায়!"

একটা ঘোর আশঙ্কারাহুতে সুরবালার মন গ্রস্ত হইল! সে চলৎশক্তি রহিত হইল। পিতামহীর জানু জড়াইয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল। এই সময় উঠানে দূরে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত একটি নারীমূর্ত্তি দেখা গেল।

দিদিমা বলিলেন—"কে ও, বউমা ?"

"হ্যাঁ, কেন মা ?"

"এদিকে এস।"

সুরবালার মা তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীত হইলেন। কাছে আসিয়া বলিলেন—"এখনো গঙ্গাস্নানে যাওনি মা!"

"আর মা, গঙ্গাস্নানে যাব! মা গঙ্গা এখন শীগ্‌গির নিলে বুঝ্‌তে পারি। সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"কি? কি হয়েছে মা?"

দিদিমা সব খুলিয়া বলিলেন। বধূ শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বেশ করে দেখেছ, বাস্তুবাবাই ?"

"বাস্তুবাবা বৈকি! ঐ দেখ না, আতাতলায় পড়ে রয়েছেন। আজ তিন পুরুষ ধরে অধিষ্ঠান করে রয়েছেন, বাবার কৃপায় কোনও বিপদ আপদ হয়নি! এইবার সংসার ছারখার হয়ে যাবে।"

ক্রমে বাড়ীর সকলে উঠিল। বাড়ীতে একটা বিভীষিকার আবির্ভাব হইল। সকলের মুখ শুষ্ক। কর্ত্তা উঠিয়া আসিলেন। তিনি দেখিয়া রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কে এ কায করেছ বল, নইলে ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেব।"

এ কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। এমন সময় একজন বলিল—"ঐ দেখ আতাগাছের তলায় রক্তমাখা লাঠি পড়ে রয়েছে। ভোজুয়ার লাঠি। আর কিছু নয় সেই বেটার কায।"

সকলে বলিল—"নিশ্চয় ওরি কায।"

এই কথা বলিতে বলিতে ভোজুয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একজন খোট্টা,—কয়েকদিন হইল এ বাটীতে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে। দেহের বর্ণটা মহিষের মত কালো। মাথার অগ্রভাগ কামানো। বয়স আন্দাজ কুড়ি বৎসর। এই নূতন বাঙ্গালা দেশে চাকরি করিতে আসিয়াছে।

কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন—"ভোজুয়া ইধার আও।" ভোজুয়া তাঁহার কাছে গিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন—"তোম সাপ মারা হ্যায়?"

ভোজুয়া সগর্ব্বে বলিল—"হাঁ, হাম্ মারা হ্যায়।"

"কাহে মারা?"

"সাঁপ আদমিকা দুষমণ হ্যায়, মারেগা নেহি? মারা ত ক্যা হুয়া?"

কর্ত্তা বলিলেন—"ক্যা হুয়া রে শালা? তোর বাবার সাপ?"

ভোজুয়া পিছু হটিয়া উদ্ধতভাবে বলিল—"মু সামালকে বাত করনা বাবু।"

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ত্তা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া পাগলের মত ভোজুয়ার উপর পড়িলেন। পা হইতে চটিজুতা খুলিয়া পটাপট তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। গলা ধরিয়া

"নিকাল যাও শালা নিকাল যাও" বলিতে বলিতে তাহাকে দরজার বাহির করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমে বেলা হইল, রৌদ্র উঠিল। প্রতিবেশীরা একে একে আসিয়া সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন।

সংবাদ পাইয়া পুরোহিত আসিলেন। দিদিমা তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন—"বাবা এ বিপদে রক্ষে কর। আমার সংসার যাতে বজায় থাকে, বাবা তাই কর।"

পুরোহিত বলিলেন—"ভয় কি মা, কোনও ভয় নেই। তোমরা ত আর করনি,—তোমাদের কোনও অপরাধ নেই। তবে ভিটেয় ব্রহ্মরক্তপাত হল, এইটেই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

একজন প্রতিবেশী বলিলেন—"পুরুত মশায়, এখন কর্ত্তব্য কি?"

"কর্ত্তব্য এখন,—প্রথম কর্ত্তব্য সংকার করা—ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করতে হবে। শাস্ত্রানুসারে সর্পের মুখে একটা তাম্রখণ্ড দিয়ে গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে হবে।"

পাড়ার ছেলেরা যাই শুনিল গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া মৃত সর্পকে দাহ করা হইবে, তৎক্ষণাৎ স্থির করিল সেদিন আর ইস্কুল যাইবে না।

সর্পকে বহন করিবার জন্য খাটুলি প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তোমরা কোনও চিন্তা কোরো না।

সর্পযোনিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মুক্ত হয়ে গেলেন। তোমরা তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ কর। ভাদ্রমাসে নাগপঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান আর একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলো, তা হলেই সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হবে। বাস্তুসাপ হচ্চেন কুলদেবতা কিনা। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে—

"সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ
পৃথ্বীধবস্তু বিজ্ঞেয়োবাস্তুদেব নমোস্তুতে।"

এদিকে খাটুলি তৈয়ারি হইল। সর্পের মুখে তাম্রখণ্ড দিয়া খাটুলিতে তুলিয়া রাখা হইল। কিন্তু কোনও বয়স্ক লোক তাহা বহন করিতে রাজি হইল না। সকলেই বলিল, "সাপকে বিশ্বাস নেই, মরে আবার বেচে ওঠে শুনেছি।" ছেলেরা বলিল. "কুছ পরোয়া নেই, আমরা নিয়ে যাব।"

ক্ষুদ্র খাটুলিখানি দুইদিকে দুইজনে ধরিয়া লইয়া চলিল। পরিবারস্থ পুরুষগণ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে ক্রমশঃ লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন শ্মশানঘাটে পৌঁছিল, তখন এত লোক জমিয়াছে যে গ্রামের জমিদার মরিলেও তত লোক জমিত কিনা সন্দেহ।

যথারীতি শবদাহ সম্পন্ন হইল। চিতাভস্ম গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

---

* আজকাল বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র এরূপ অনুষ্ঠান দেখা যায় না, প্রায় পুরাতত্ত্বের সামিল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনও কোন কোন পল্লীগ্রামে, উপরে যে চিত্র অঙ্কন করিলাম তাহা অবিকল ঘটিয়া থাকে।—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই অস্বাভাবিক শোকের মধ্যে সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যা-বেলায় বড়ঘরের বারন্দায় বসিয়া কর্ত্তা ধূমপান করিতেছেন। দেওয়ালে একটি বাতি জ্বলিতেছে। সদর দরজা খোলা ছিল। আস্তে আস্তে ভোজুয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা বৃহৎ হাঁড়ি। মুখে ময়দা দিয়া সরা আঁটা।

সে আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইল। দিদিমা দূর হইতে বলিলেন, "কেরে, ভোজুয়া নাকি ?" সে প্রথমতঃ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিকটে কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া বলিল,—"বাবু, হাম্ তুম্‌হারা একঠো সাঁপ মার ডালা,—উস্‌কা বদ্‌লা দোঠো সাঁপ লায়া ইয়ে লেও।" বলিয়া হাঁড়িটা দড়াম করিয়া কর্ত্তার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হাঁড়ি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা সাপ বাহির হইয়া পড়িল। কর্ত্তা মহাভীত হইয়া "ওরে বাপ্‌রে" বলিয়া লাফাইয়া পলাইতে গেলেন, কিন্তু সাপ দুইটা তাঁহার পায়ে দুই তিন ছোবল বসাইয়া দিল। কর্ত্তার চীৎকারে বাড়ীসুদ্ধ লোক আসিয়া জড় হইল। আসিয়া দেখিল তিনি মাটিতে পড়িয়া চক্ষু অর্দ্ধমুদিত অবস্থায় কেবল বলিতেছেন—"হরে নারায়ণ ব্রহ্ম, হরে নারায়ণ ব্রহ্ম।"

দিদিমা আকুল হইয়া তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে দূর হইতে তিনি তাহা

সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মনে করিলেন বাস্তুহত্যার প্রতিফল হাতে হাতেই আরম্ভ হইল। সুরবালা ও সুরবালার মা উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল পুরোহিত ঠাকুরের স্বস্ত্যয়নে কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, নয়ত বাস্তু বাবা তুষ্ট হইলেন না কেন?

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ছিল, সকলের কথা অনুসারে সে রোজা ডাকিতে ছুটিল। গ্রামের প্রান্তভাগে একজন বেদিয়া বাস করে, সে চারি পাশের বহু গ্রামের সর্প বৈদ্য। বেদিয়ার কথায় প্রকাশ হইল তাহারই নিকট হইতে একটা খোট্টা পাঁচ টাকা দিয়া এক জোড়া সাপ কিনিয়াছিল।

বেদিয়া আসিয়া বলিল—"সেই খোট্টা শালারই এই কায। এমন জানলে কি আমি তাকে সাপ বেচি মশাই! পাঁচ টাকা ছেড়ে পঞ্চাশ টাকা দিলেও দিতাম না। সে বল্লে আমি সাপ মেরে ওষুধ তৈরি করব। হায় হায় হায়।"

নাড়ী টিপিতে টিপিতে তাহার মুখ কিন্তু ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—"কোনও ভয় নেই, আপনাদের ও আমার পুণ্যির জোরে তাকে ভুলক্রমে দুটো বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ দিয়েছিলাম দেখছি। আঃ বাঁচলাম। নরহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলাম। বিষের কোন লক্ষণই নেই—শুধু একটু রক্তপাত হয়েছে, আর ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। কোনও চিন্তা নেই।"

দিদিমা বলিয়া উঠিলেন "জয় মা দুর্গা।"

কর্ত্তা বলিলেন—"নিশ্চয়ই জান বিষ ছিল না?"

বেদিয়া রাগিয়া বলিল—"আমি আর জানিনে মশাই! আমি হলাম গিয়ে সাপের রোজা।"

সে যাত্রা কর্ত্তা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, খোট্টা চাকর আর বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিতে দেন নাই।

সচ্চরিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে বুধবারের গেজেটে খবর বাহির হইল সুরেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার পরের বুধবারেই ভাগলপুর হইতে তাহার কাকার মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়। তাঁহাকে ও তাহার দুই দাদাকে এই কাকাই ভাগলপুরে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন;—সুতরাং কাকার মৃত্যুতে সুরেন্দ্র দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল।

কাকা ভাগলপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। সুরেনের দাদারা ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখে নাই—তাঁহাদের তিনি সামান্য চাকুরি জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আইন পাস করিয়া সুরেন ওকালতী করে;—সুরেনও নিজের জীবনের গতি ঐ পথেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ দেখিল আইন পড়ার খরচ যোগাইবার আর কেহ নাই।

সুরেনের মাকে সকলে পরামর্শ দিলেন—"ছেলের বিয়ে দাও—শ্বশুর পড়ার খরচ যোগাবে।" কিন্তু সুরেন বলিল—"কৃতী না হয়ে বিয়ে করব না।"

আইন পড়িয়া উকীল হইবার মৎলবও ছাড়িতে পারিল

না। মাকে বলিল—"কল্‌কাতায় যাই,—ছেলে পড়িয়ে কিছু উপার্জ্জন করব, তাইতে আমার বাসা-খরচ চলে যাবে।"

বিধবা মাতার সামান্য পুঁজি ভাঙ্গিয়া কয়েকটি টাকা লইয়া সুরেন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইল। কলেজে নাম লেখাইল।—কয়েক দিনের চেষ্টায়, দশটাকা বেতনের একটি প্রাইভেট্ টিউসনও জুটিল; আর দশটি টাকা জুটিলেই কোনও রকমে বাসা খরচের সংস্থানটা হইয়া যায়।

কিন্তু এই দশটি টাকা জুটিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাড়ী হইতে টাকা যাহা আনিয়াছিল, তাহা ফুরাইল, সুরেন্দ্র মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল!

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুরেন্দ্র তাহাদের বাসার ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল,—আর ভাবিতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে ক্রমে নয়টা বাজিল, দশটা বাজিয়া গেল। ছাদের অন্যত্র বাসার অন্যান্য যুবকেরাও পদচারণা করিতেছে। কেহ সিগারেট খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা গুণ গুণ করিয়া থিয়েটারের গান গাহিতেছে।

হঠাৎ নিম্নে সুরেন্দ্র একটা কণ্ঠ শুনিতে পাইল—"সুরেন বাবু হ্যায়?"

সরমন্ চাকর বাসন মাজিতেছিল, সে উত্তর দিল—"বাবু ছাদমে আছে, দেখা হোবে।" বঙ্গভাষায় আলাপ করা সরমনের উচ্চাভিলাষ; কেহ তাহাকে হিন্দীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে বাঙ্গালাতেই উত্তর দিত।

আগন্তুক তখন খট্ খট্ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

"কেও—রজনী দাদা যে!"

"সুরেন, ভাল আছিস্?"

রজনী দাদা সুরেনেরই গ্রামের লোক। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। মার্চ্চেন্ট আপিসে চাকরি করেন। অনেক টাকা উপার্জ্জন।

হ্যারিসন্ রোড্ হইতে বিদ্যুতের আলোক আসিতেছিল,—সে আলোকে সুরেন্দ্র দেখিল রজনীর পায়ে রেশমী মোজা চিক্‌চিক্ করিতেছে—তদুপরি পম্প্‌শু। গায়ে রেশমী পঞ্জাবীর উপর জরির পাড় দেওয়া কোঁচান চাদর। চুল হইতে সেণ্টের ও মুখ হইতে মদ্যের গন্ধ আসিতেছে।

"সুরেন ভাল আছিস্?"

"ভাল আছি। হঠাৎ যে রজনী দাদা? খবর কি?"

রজনী বলিল—"একটা কথা আছে। এখানে বলব? তোর ঘরে চল্ না।"

সুরেন স্বর নামাইয়া বলিল—"ঘরেও ত লোক আছে।"

রজনী বলিল—"তবে আয়,—আমার সঙ্গে আয়। পথে বলব। নে চট্ করে জামা পরে একটা চাদর নে।"

এই বলিয়া রজনী চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল। সুরেন নামিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে দুইজনে রাস্তায় নামিল। দরজার কাছে একখানা ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উঠিয়া রজনী বলিল—"আয়।"

সুরেন উৎসুক হইয়া বলিল—"কোথা নিয়ে যাচ্চ আমায়? কি বলবে এইখানেই বল না।"

গ্রামে রজনীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি নাই। সুরেনের মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বারম্বার করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন "রোজোটার" সঙ্গে মিশিয়া বিগ্‌ড়াইয়া না যায়। সেই কথা সুরেনের মনে পড়িতে লাগিল।

রজনী বলিল—"আমি যাচ্চি থিয়েটারে। এখানে দাঁড়িয়ে বল্লে আমার দেরী হয়ে যাবে। পথে পলব। এইটুকু আর হেঁটে আস্‌তে পার্‌বিনে? ভারি নবাব হয়েছিস্‌ যে দেখছি। আয় আয়।"

সুরেন্দ্র উঠিল। রজনী গাড়োয়ানকে হুকুম দিল "বিডিন ইষ্টিট্।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গাড়ী চলিলে সুরেন জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার খানা কি?"

"তোর জন্তে একটা প্রাইভেট্ টিউশন্ ঠিক করেছি।"

সুরেন খুসী হইয়া বলিল—"কোথায়? কত?"

"কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীটে। পঁচিশ টাকা।"

সুরেন শুনিয়া মহা খুসী। বলিল—"পঁচিশ টাকা! বল কি রজনী দাদা! কখন?"

"বিকেলে দু'ঘণ্টা।"

"কি পড়াতে হবে?"

"এক ঘণ্টা বাঙ্গালা, এক ঘণ্টা ইংরিজি।"

হঠাৎ সুরেনের মনে হইল, যখন অত বেশী টাকা, তখন বোধ হয় একাধিক ছাত্র; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল—"কটি ছেলে?"

রজনী বলিল—"একটিও না।" বলিয়া জোরে জোরে চুরুট টানিতে লাগিল।

সুরেন বলিল—"একটিও না! তার মানে কি?"

"ছেলে একটিও না। মেয়ে একটি।"

"মেয়ে? কত বড় মেয়ে?"

রজনী হাসিয়া বলিল—"তোর সে খোঁজে কায কি! তুই যাবি,—পড়াবি। বয়স যতই হোক না।"

সুরেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

রজনী তখন উদার ভাবে বলিল—"বয়স পনেরো বছর।"

সুরেন বয়স শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্রাহ্ম?"

"না।"

"ক্রিশ্চান্?"

"না।"

"তবে কি? হিন্দু নাকি?"

"তাই।"

"হিন্দু! অত বড় মেয়ে, পড়বে? কার মেয়ে, বাপের নাম কি?"

রজনী হাসিয়া বলিল—"খোদা জানে। মার নাম জিজ্ঞাসা করিস্ ত বল্‌তে পারি।"

সুরেন উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

"মার নাম আমোদিনী। বেঙ্গলের আমোদিনী। নাম শুনেছিস্ ?"

কিন্তু এ সংবাদে সুরেনের সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"শুনেছি।"

রজনী বলিল—"ক বলিস্ ?"

সুরেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিল—"আমার দ্বারা হবে না।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

সুরেন্দ্র উত্তেজিতভাবে বলিল—"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব ? কথনই নয়।"

রজনী বলিল—"অতি গর্দ্দভ তুই! কেন ? আপত্তিটা কি শুনি ?"

সুরেন বলিল—"আপত্তি অনেক।"

"কি ? এ উপার্জ্জন অনেষ্ট্ নয় ?"

"অনেষ্ট্ হবে না কেন!"

"তবে ? নিজে পাছে প্রলোভনে পড়ে যাস্ ?"

সুরেন গর্ব্বিতভাবে বলিল—"সে ভয় করিনে।"

"তবে ? তবে কি আপত্তি বল্।"

"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব ? লোকে শুনলে বলবে কি ?"

রজনী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বলিল—"অতি গর্দ্দভ তুই! বি, এ পাস করে এমন কথাটা বল্লি ? লোকে কি বলবে না বলবে সেই ভয়েই জড় সড়!"

সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রজনী বলিল—"শোন্। ও

আপত্তি কোনও কাযের নয়। আর, লোকের জানবার দরকারই বা কি? পড়াতে যাচ্ছিস্ না পড়াতে যাচ্ছিস্। কাকে পড়াতে যাচ্ছিস্, কোথায় পড়াতে যাচ্ছিস্ এত খবর তোর লোকের কাছে দেবার দরকার কি? তবে হ্যাঁ, যদি বুঝিস্ নিজের মনে যথেষ্ট বল্ নেই—চরিত্র ঠিক রাখতে পারবিনে—তাহলে অবিশ্যি নেওয়া উচিত নয়। সেইটে বেশ করে বুঝে দেখ্ নিজের মনে।"

নিজের চরিত্রের বলের প্রতি সুরেনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কথায় তাহার আত্মাভিমান আঘাত প্রাপ্ত হইল। সগর্ব্বে বলিল—"সে জন্যে ভেব না।"

রজনী বলিল—"তবে নে। টাকা নিয়ে কথা রে ভাই! যে টাকা দেবে তার কায করব। অমনি ত 'আর টাকা নিচ্চিনে।"

সুরেন ভাবিয়া বলিল—"বাড়ীর লোকে যদি শোনে ত কি বলবে?"

রজনী বলিল—"অতি গর্দ্দভ তুই! বাড়ীর লোকে জানবে কি করে? এ কলকাতা সহর সমুদ্দুর! কে কার খবর রাখে—তুইও যেমন!"

গাড়ী এই সময়ে থিয়েটারে পৌছিল। রজনী বলিল—"তা হলে, কি বলিস্? আজ আমোদিনীর সঙ্গে দেখা হবে আমার,—কি বলব?"

সুরেন একবার মনে করিল বলি—"না।" আবার ভাবিল,—"এত তাড়াতাড়ি কি,—না হয় দু'দিন পরেই বল্‌ব।" বলিল—"রজনীদা, ভেবে তোমায় দুই এক দিন পরে বল্‌ব।"—বলিয়া বিদায় চাহিল।

রজনী বলিল—"আচ্ছা, তা যে রকম হয় আমায় লিখিস্; কিন্তু ঐ কথা রে ভাই। যদি বুঝিস্ নিজে ঠিক থাকতে পারবি,—নিজের মনে এক চুল এদিক্ ওদিক্ হবে না,—তবেই নিস্। আমরা ত বয়ে গিয়েইছি। তোরা এখন ছেলে মানুষ আছিস্,—গোড়া থেকে সাবধান হওয়া ভাল।" বলিয়া রজনী থিয়েটারে প্রবেশ করিল,—সুরেনও ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি সুরেনের ভাল নিদ্রা হইল না,—অনেক ভাবিল। পরদিনও সারাদিন ভাবিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যদি কাযটা অস্বীকার করি তবে রজনী দাদা ভাবিবে, নিজের চরিত্র-বলের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নাই বলিয়াই অগ্রসর হইল না। এই ভাবের সহিত,—অর্থকৃচ্ছ্রতাও মনে প্রবলরূপে আধিপত্য করিতে লাগিল। পঁচিশ টাকা। দশ টাকা আর পঁচিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা। যদি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ করি, তাহা হইলে পনেরো টাকা করিয়া জমিবে। তিন বৎসর যদি মাসে পনেরো টাকা করিয়া জমে, তাহা হইলে পাঁচশত টাকারও উপর হাতে হইবে; ওকালতী পাস করিলে, তাহা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিব।

আবার ভাবিল, তিন বৎসর ধরিয়া যদি আমি ঐ বেশ্যার মেয়েটাকে পড়াই, তাহা হইলে কি জানাজানি হইতে বাকী থাকিবে! ছি ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি হইবে।

অবশেষে স্থির করিল এক কাষ করা যাউক্। এখন কাযটা লই। এ দিকে অন্য প্রাইভেট্ টিউসন জুটাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে থাকি। আর একটা সুবিধামত জুটিলেই ওটা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। রজনী দাদা যাহা বলিয়াছে ঠিকই বটে,—পরিশ্রম করিব, টাকা লইব,—কিরূপ লোকের টাকা অত আমার হিসাব করিবার দরকার কি?

জানাজানির ভয়টা যখনই মনে উদিত হইতে লাগিল, তখনই কিন্তু উৎসাহ ভারি কমিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারও ঔষধ রজনী দিয়া গিয়াছে। 'কলকাতা সহর সমুদ্দুর,—কে কার খবর রাখে!'

ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনী দাদাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ করিয়া, খামে ভরিয়া সতর্ক সুরেন্দ্রনাথ ভাবিল,—কাগজে কলমে এর সাক্ষী সাবুদ রাখি কেন? যাই, মুখেই গিয়া রজনী দাদাকে বলিয়া আসি।

চিঠি ছিঁড়িয়া, আগুন জ্বালিয়া পুড়াইয়া ফেলিল। বাহির হইয়া বউবাজারে রজনী দাদার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে রজনী পাশা খেলিতেছে ও মদ খাইতেছে।

সুরেন খানিক বসিয়া খেলা দেখিল। একটা বাজি শেষ হইলে রজনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে, খবর কি?"

সুরেন বলিল—"খবর ভাল। একটা কথা বলতে এসে-ছিলাম।"

রজনী বলিল—"ওঃ, আচ্ছা দাঁড়া।" বলিয়া তাহার গেলাসের মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল—"আয়।"

দুই জনে একাকী হইলে রজনী বলিল—"কি ঠিক করিলি?"

সুরেন বলিল—"নেওয়াই ঠিক করলাম।"

রজনী বলিল—"তা বেশ; কিন্তু খুব সাবধান রে ভাই! ধরি মাছ না ছুঁই পানি, বুঝেছিস্ ত! তোকে জানি ছেলে বেলা থেকে তুই অতি সৎ ছোক্‌রা, তাই সাহস করে তোকে এ কাযে যেতে দিচ্চি। আমি আমোদিনীকে গর্ব্ব করে বলেছি, যে তুই অতি সৎচরিত্র, কোনও রকম কিছু খেলাপ হবে না।"

সুরেন বলিল—"কেন রজনী দাদা—সচ্চরিত্রতা নিয়ে এত মারামারি কেন এ সব লোকের?"

রজনী বলিল—"আঃ—এইটুকু বুঝতে পার্‌লিনে, বি, এ, পাস করেছিস! অতি গর্দ্দভ তুই। কেন, বলি শোন্। আমোদিনী একজন মস্ত এক্‌ট্রেস্। ওর ইচ্ছে, ওর মেয়েও একদিন একটা মস্ত এক্‌ট্রেস্ হয়। সেই জন্যে ভাল রকম লেখা পড়া শেখাচ্চে। ওরা প্রথম প্রথম মেয়ে পড়াবার জন্য বুড়ো-গোছ পণ্ডিত টণ্ডিত রাখত; কিন্তু বুড়ো হলে হবে কি,—বুড়ো-দের প্রাণে আবার বেশী সখ্। পড়ায় না,—খালি ইয়ার্কি দেয়। কেউ কেউ মেয়ে নিয়ে চম্পটও দিয়েছে। তাই ওরা এখন ভাল লোক চায়। কলেজের সচ্চরিত্র দেখে লোক রাখলে কোনও ভয় থাকবে না—এই জন্যে আর কি,—বুঝেছিস্?"

সুরেন বলিল—"ওঃ—তা বটে।" ভাবিতে তাহার মনে বেশ একটু গর্ব্ব হইতে লাগিল যে, সে একজন কলেজের ভাল সচ্চরিত্র শ্রেণীর লোক,—নিজে যাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, তাহারাও এই বিশুদ্ধতার মূল্য বুঝে।

রজনী বলিল—"তবে ঠিকানা দিচ্চি। কাল কি পরশু এক-দিন যাস্,—গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে নিস্।"

সুরেন বলিল—"না রজনী দাদা, আমি একলা যেতে পারব না।"

"কেন? কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ চিনিস্ নে?"

"তা চিনি, কিন্তু একলা আমি যেতে পারব না রজনী দাদা।"

"অতি গর্দ্দভ তুই! আচ্ছা আসিস কাল বিকেলে, নিয়ে যাব এখন সঙ্গে করে।"

পরদিন রজনী সুরেনকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুরেনের ছাত্রীর নাম নলিনী। পড়ে মেঘনাদবধ, সীতার বনবাস আর রয়্যাল্ রীডার নম্বর থ্রি। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। আর এমন শান্ত ও শিষ্ট—যেন গৃহস্থঘরের মেয়ে। ইংরাজী কি পড়ে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে নলিনী বলিয়াছিল, "রয়্যাল রীডার নম্বর থার্ড।" সুরেন সংশোধন করিয়া দিল, "নম্বর থ্রি বলবে, "থার্ড" হয় না।" তখনি বিনীতভাবে "নম্বর থ্রি" বলিয়া নিজেকে বালিকা সংশোধন করিল।

শনিবার অবধি নিয়মিতভাবে সুরেন তাহাকে পড়াইল। তাহার মা আসিয়া মাঝে মাঝে পড়া শুনিয়া যাইত।

রবিবারে ছুটি—রবিবারে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। সুরেন মনে মনে বলিল—"আঃ বাঁচা গেল, আজ আর বেরুতে

হবে না।" যতটা খুসী হইবার কথা, মন কিন্তু ততটা খুসী হইতে রাজি হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি মেয়েটি পরমা সুন্দরী।

পরের সপ্তাহে,—পাঠের মাঝে মাঝে সুরেন একটু আধটু গল্প করিল। ভাগলপুরের গল্প, আরও নানাদেশের গল্প, নানা বিষয়ের গল্প। গল্পের আধিক্যবশতঃ এক এক দিন পড়ার কামাই হইয়া যাইত; সে অপব্যয়টুকু পূরাইয়া দিবার জন্য সেদিন সুরেন দুই ঘণ্টার একটু অতিরিক্তও থাকিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে রবিবার আসিল, সেটা নিতান্তই নীরস মনে হইতে লাগিল। সেদিন নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে করিল—আহা! মেয়েটির অদৃষ্টে কি আছে? এখনও অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্ম্মল, বিধাতার স্বহস্তনির্ম্মিত একটি শুভ্র আত্মা। এও কি পাপে পঙ্কিল হইবে—ইহাই ধ্রুব বিধান? ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন উপায় নাই?

সে রাত্রে সুরেন স্বপ্ন দেখিল যেন নদীর ধারে একটা শালবন, সেই শালবনে যেন নলিনীর সঙ্গে বেড়াইতেছে।

পরদিন পড়াইতে পড়াইতে স্বপ্নের গল্পটা নলিনীকে সুরেন বলিল।

নলিনী বলিল—"কি করে স্বপ্ন দেখে বলুন দেখি?"

সুরেন বলিল—"এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, দিনেরবেলা আমরা যা চিন্তা করি রাত্রে তাই স্বপ্নে দেখি।"

নলিনী বলিল—"না, তা নয়। আমাদের আত্মা আছে কি না। একজনকার আত্মা যদি আর একজনকার আত্মার কাছে

যায়, তাহলে তুজনেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘুম ভাঙলে শুধু একজনকার মনে থাকে একজন ভুলে যায়।"

সুরেন বলিল—"বাঃ বেশ ত!"

মাষ্টার বাবু আসিলে ঝি রোজ টেবিলের উপর কয়েক খিলি পাণ রাখিয়া যাইত। একদিন সুরেন বলিল—"আজকের পাণটা খুব ভাল হয়েছে, অন্য দিনের চেয়ে।"

নলিনী বালিকাসুলভ গর্ব্বে বলিল—"ভাল হয়েছে আজ?—আমি সেজেছি আজ মাষ্টার মশায়!"

সুরেন বলিল—"বটে! তুমি এমন পাণ সাজতে পার? আমাদের বাসায় যে পাণ সাজে, রাম রাম।"

পরদিন পাঠান্তে বিদায় লইবার সময় নলিনী সুরেনকে বলিল—"আপনাদের বাসায় পাণ ভাল হয় না বলছিলেন, গোটাকতক পাণ তৈরি করেছি নিয়ে যাবেন?"

সুরেন পাণ লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"ভারি লক্ষ্মী তুমি।"

নলিনীকে তাহার মাতা একটু স্বতন্ত্র রকমে পালন করিয়াছিল, তথাপি সুরেনের কাছে নলিনী যে জগতের সংবাদ পাইত, সে জগৎ নলিনীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন; তাহার জগৎ, যে জগৎ আবাল্য তাহাকে ঘিরিয়া আছে, সে জগতে এ জগতে কত প্রভেদ। সুরেন তাহার মার গল্প, কাকীমার গল্প, কাকার মেয়েদের বিবাহের গল্প যখন করিত, একটা কি অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় নলিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সুরেনের জগতের সংবাদ নলিনীর কাছে পিপাসার শীতল জলের মত লাগিত। সুরেনের প্রতি নলিনী একটা অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর কণ্ঠস্বরের মধুরতায়, যৌবনের নবীনতায় ও অন্তরের সরসতায় সুরেনও যেন একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিল। কিছু দিনে সে নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; কিন্তু কোনও প্রতিকার চেষ্টা করিল না। বুঝিল মন তাহার বশের অতীত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সুরেনের মনের অবস্থা এমন হইল যে নলিনীকে তাহার মন্দসংসর্গ হইতে উদ্ধার করাই তাহার একমাত্র পুরুষার্থ স্থির করিল। ইহাতে তাহার মানব জন্মের সফলতা জ্ঞান করিল। প্রেমের নির্দ্দেশে কর্ত্তব্যের পথ অতি সরল বোধ হইল। নলিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেও বিলম্ব হইল না। তাহাকে শ্রদ্ধায়, আশায়, ও সুখে পুলককম্পিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল—"আমি তোমার স্বামী, তোমায় না পেলে আমি সুখী হব না; আমায় না পেলে তুমিও সুখী হবে না। তোমাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করব, লোকের কথার জন্য ভয় করব না। পৃথিবী কি যথেষ্ট বৃহৎ নয়? আমরা এমন কোথাও যাব যেখানে লোকগঞ্জনা আমাদের অনুসরণ করবে না। কি খাব? পরিশ্রম করব;—দুজনে পরিশ্রম করব। দুবেলা না জুটে, এক বেলা খেয়ে থাকব। তাতেও আমরা সুখে থাকব।—"

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ঝি আলো আনিল। সুরেনের সম্মুখে নলিনীর অনুবাদের খাতা ছিল, তাহা সংশোধনের জন্য দক্ষিণ হস্তে কলম ধরিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাম হস্ত নলিনীর হস্তে সংযুক্ত ছিল। যখন ঝির পদধ্বনি শুনা গেল, তখন দুই জনেই ত্রস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইহার পর চারিটি সপ্তাহ সুরেন ও নলিনী পরস্পরের নেশায় ভরপূর মাতিয়া রহিল।

সোমবার বৈকালে পড়াইতে গিয়া সুরেন শুনিল নলিনী নাই,—সে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়াছে। আমোদিনী আসিয়া বলিল—নলিনী এখন মাসকতক সেখানে থাকিবে, কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহ্য হইতেছিল না। আবার যখন আসিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে আবার আমোদিনী সুরেন্দ্রকে সংবাদ পাঠাইবে। এই বলিয়া সুরেনের প্রাপ্য আমোদিনী চুকাইয়া দিল।

সুরেন চলিয়া গেল, কিন্তু বাসায় গেল না। গড়ের মাঠে গিয়া একটা নিভৃত স্থান খুঁজিয়া, ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন? শনিবারে যখন নলিনীর কাছে বিদায় লইয়াছে, তখন নলিনী কিছুই জানিত না, জানিলে অবশ্যই সুরেনকে বলিত। সহসা এ কি হইল!

গিয়াছে, তাহাও দুই চারি দিনের জন্য নয়। কয়মাস থাকিবে তাহার অবধি স্থিরতা নাই। কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইতেছিল না! বাজে কথা। আজ দুইমাস প্রতিদিন তাহাকে দেখিতেছি, একদিনও ত সেরূপ মনে হয় নাই।

অন্ধকার হইল; আকাশে নক্ষত্র, অদূরে গ্যাস্ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল।

নলিনী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ। সুরেনের এখন মনে হইতে লাগিল, সেই কথার সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও সংযোগ আছে। হয়ত তাহার মাতা তাহার উপর কোনও জুলুম করিতেছে। নলিনী এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে মনে করিতে সুরেনের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই এক মাসের কত ঘটনা, কত সুখ, কত হাসি, কত মিষ্ট কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত স্বপ্ন দেখা—সেই স্বপ্নের জাগ্রত অনুকরণ, কত মানাভিমান মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়ে, তত যেন বুক ফাটিয়া যায়।

আর দেখা হইবে না।

ক্রমে ঘাসের উপর সুরেন শয়ন করিল। রাত্রি দশটা অবধি বালকের মত কাঁদিল। দশটা বাজিলে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিল।

সপ্তাহ কাটিল; সপ্তাহ পরে শোক অনেকটা লাঘব হইল। তখন মনে হইল—"উঃ, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি।"

"কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম!"

'কি সর্ব্বনাশটাই হইতে বসিয়াছিল!"

"কি মোহেই পড়িয়াছিলাম। ভগবান এ জাল কাটিয়া দিলেন—এ পরম সৌভাগ্য। নিজে কাটিতে পারিতাম না।"

"কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম কে জানে! যদি শুনিতাম তাহার মাতা তাহাঁর প্রতি অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে লইয়া তখনই কোথায় চলিয়া যাইতাম। তাহা

হইলে জন্মের মত যাইতাম আর কি! এ জীবনে সে ভাঙ্গা আর যোড়া লাগিত না।”

দুই সপ্তাহ পরে সুরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটির আর দুই সপ্তাহ বাকী। বৈকাল বেলা সুরেন বাসার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বঙ্কিম বাবুর “ধর্ম্মতত্ত্ব” পড়িতেছিল, ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়া সুরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল,—নলিনীর হস্তাক্ষর।

চিঠির ছাপ দেখিল—ভবানীপুর।

চিঠি খুলিল। তাহা এইরূপ।

“৪৪।১নং নীলমণি বসুর গলি,
ভবানীপুর।

প্রিয়তম!

আজ একমাস তোমায় দেখি নাই, কিন্তু বাঁচিয়া আছি। বড় কষ্টে আছি। বেশী লিখিবার সময় নাই। এখানে আমি অত্যন্ত কড়া পাহারায় আছি। যে বৃদ্ধা আমার রক্ষয়িত্রী তাহার কন্যা আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহারই সাহায্যে এ পত্র ডাকে দিবার আয়োজন করিয়াছি।

যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন সন্ধ্যাবেলা মা আমার প্রতি ভারি অত্যাচার করে। আমি অনেক কাঁদি। মা আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে,—আমি স্বীকার করি যে আমি তোমায় ভালবাসি। মা বলিল—তুমি ভিক্ষুক, নিজে খাইতে পাওনা ইত্যাদি। যদিও বা আমায় বিবাহ কর, লোকগঞ্জনায় অপমানে অস্থির হইয়া দুই দিন বাদেই আমাকে

পরিত্যাগ করিবে। আরও বলিল, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমায় ভুলিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আমায় এইখানে আনিয়া রাখিয়া গেল।

আমি এ একমাস অনেক ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে যে আমার চিরবিচ্ছেদ হইল এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। একদিন আমাদের মিলন হইবে এ আশা এক মুহূর্ত্তের তরে আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মিলন হইলে তোমার অবস্থা কি হইবে তাহাও আমি ভাবিয়াছি। লোকে তোমায় কি বলিবে তাহা মনে করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার একার সুখের জন্য হইলে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতাম; কিন্তু হে আমার স্বামী, আমায় না পাইলে তুমিও সুখী হইবে না এ বিশ্বাস তুমি আমার মনে জন্মাইয়াছ। তোমার সুখের ও আমার সুখের জন্য আমাদের মিলনই আমি আকাঙ্ক্ষা করি।

আমার এ পত্রের উত্তর তুমি ডাকে দিও না। কাল সন্ধ্যা-বেলা চিঠি হাতে করিয়া আসিও। ভবানীপুরে যে পদ্মপুকুর আছে তাহার উত্তর পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও। একজন স্ত্রীলোক তোমার নাম করিয়া ডাকিবে, তাহার হাতে পত্র দিও, তাহা হইলে আমি পাইব।

তোমারই নলিনী।

"ঠিক সাতটার সময় আসিও।"

পত্র পড়িয়া সুরেন নীচে নামিয়া গেল। ঝিকে ডাকিয়া দুই আনার জলখাবার আনিতে দিল। নিজের জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। বাসার লোককে বলিল—"বাড়ী হতে এইমাত্র

চিঠি পেলাম, মার ভারি ব্যারাম, এখনি আমায় রওনা হতে হবে।"

জলখাবার আসিলে চাকরকে বলিল—"সরমন্ একখানা গাড়ী ডাক জল্‌দি।" গাড়ী আসিলে, জিনিষ পত্র লইয়া হাওড়ায় গেল। রাত্রি এগারটার সময় বাড়ী পৌঁছিল।

মাকে বলিল—"কলকাতায় ভারি কলেরা হচ্ছিল তাই পালিয়ে এলাম।"

ভুলশিক্ষার বিপদ।

বড়দিনের ছুটিটা মধুপুরে গিয়া যাপন করিবার জন্ত তাগাদার উপর তাগাদা পাইতেছি ; না গেলে আর চলে না। মধুপুরে আমাদের একটি ছোট বাঙ্গলা আছে। শীতকালে প্রায়ই আমাদের বাড়ীর কয়েকজন করিয়া সেখানে গিয়া অবস্থান করেন। এবার বড়দিদি নিজের পুত্র কন্তাদের লইয়া সেখানে অবতীর্ণ; সুরেন ভায়া এবার বি, এ, পরীক্ষা দিবেন,—তিনি সেখানে আপন পাঠ অভ্যাস এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। দিদির মেয়ে মিনি বা মেনকারাণী আমায় মারাত্মক রকম শাসাইয়াছে, সে লিখিয়াছে—"এবার যদি তুমি না আসবে তবে আর তোমার মাথার একটিও পাকা চুল তুলে দেব না—যাও।" আর কি করিয়া থাকি ? সুতরাং জিনিষপত্র গুছাইয়া অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় হাবড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

উঃ—সেদিন কি ভীড় !—কিন্তু একটা এই শুভগ্রহ শুধু ভদ্রলোকের ভীড়। অধিকাংশই নব্যযুবক,—উত্তম পরিচ্ছদে আবৃত ; সুগন্ধময়। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, হাস্ত পরিহাসে প্রদীপ্ত। মনে হইল যেন কলিকাতার অধিকাংশ তরুণবিরহী যুক্তি করিয়া এই ট্রেনেই শ্বশুরালয় যাত্রা করিয়াছে। এরূপ জনসংঘ ক্লান্তিজনক নহে—বরং তাহার বিপরীত।

গাড়ী ছাড়িল। যুবকগণ উচ্চহাস্যে ও সিগারেটের ধূমে কক্ষবায়ু ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। হুগলি অবধি খুব ভীড় রহিল,—তাহার পর হইতে একটু কমিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে একটি স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথায় একটা কালো কম্‌-ফর্টার পাগড়ীর আকারে জড়ান,—চোখে রূপার ফ্রেমযুক্ত চশ্‌মা, দেহটি একযোড়া সেকালের দৌড়দার হাঁসিয়াযুক্ত গঙ্গাজলী শালে আবৃত; পায়ে গরম ফুলমোজার উপর ইংরাজি জুতা। বয়স বোধ করি পঞ্চাশতের কাছাকাছি হইবে।

বাবুটির সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছিল, জিনিষপত্রও বিস্তর। জিনিষপত্রে কামরা বোঝাই হইয়া গেল। নীচে হইতে একজন বলিল—"সব উঠেছে ত—একবার গুণে নিন।" শ্রবণ মাত্র বাবুটি এক দুই করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিনিষ গণনা আরম্ভ করিলেন, গাড়ি ছাড়িবারও ঘণ্টা দিল।

দুইবার গণনা করিয়া বলিলেন—"ওরে ছটা কেন রে—কি ওঠেনি রে, স্থাখ্ স্থাখ্।" তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাবুটি হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হাঁড়িটা—হাঁড়িটা—হাঁড়িটা—"

একজন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল, তাঁহার হাতে হাঁড়িটা দিতে গেল; কিন্তু তিনি তাহা ধরিতে পারিলেন না; হাঁড়িটা পড়িয়া গেল। আমরা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার শব্দটা শুনিতে পাইলাম।

ভদ্রলোকটি তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সবেগে বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্যে আমাকেই

একটু "মুরুব্বি" গোছ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখলেন মশাই? একবার কাণ্ডখানা দেখলেন? দিলে হাঁড়িটে ফেলে!"

আমি লোকটার এই আপিলে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলাম। কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলাম—"কি ছিল হাঁড়িতে?"

"মশাই—খাবার ছিল। এক হাঁড়ি খাবার ছিল—দুটাকার মাল। গেল প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে ধূলো মাখামাখি হয়ে। ভোগে হল না। সেই বাড়ী থেকে পৈ পৈ করে বল্‌তে বল্‌তে আসছি 'ওরে দেখিস, যেন খাবারের হাঁড়িটে ভুলে যাস্‌নে।'—'ওরে দেখিস্, যেন খাবারের হাঁড়িটে ভুলে যাস্‌নে।'—তা সেই খাবারের হাঁড়িটেই ভুলে গেল! এক হাঁড়ি খাবার মশাই! ভোগে হল না। আমি আবার বাজারের খাবার গুলো খাইনে কি না। ও আমার আদৌ সহ্য হয় না। আমি যেখানে যাই নিজের খাবার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমার পিসিমা আজ ভোর পাঁচটার সময় উঠে লুচি ভাজতে বসেছেন। (এই খানে বাবুটি আঙুল গণিতে আরম্ভ করিলেন) লুচি ছিল, কচুরি ছিল, আলু ভাজা ছিল, বেগুণভাজা ছিল, মোহন ভোগ ছিল, মোল্‌নাইয়ের গোল্লা ছিল আধ সের—মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খেয়েছ কখনও?"

বক্তৃতার আরম্ভ হইতে সহযাত্রী যুবকগণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল; এই প্রশ্নে হাহা করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আমি যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলাম—"কৈ মনে ত পড়ে না।"

বাবুটি বলিলেন—"তা হলে খাওনি। খেলে মনে থাকত। সে ভোলবার জিনিব নয়।"

আমি বলিলাম—"খুব সম্ভব।"

"মোল্‌নাইয়ের গোল্লার নামডাকও শোন নি ?"

"না—ও বিষয়ে বড় একটা চর্চ্চা রাখিনে।"

"কোথা থেকে আসছ ?"

"কলকাতা।"

"নিবাস ?"

"কলকাতা।"

"অ্যাঃ—নিতান্ত ক্যাল্‌কেশিয়ান তুমি! আচ্ছা মোল্‌নাই-য়ের গোল্লার একটা গল্প বলি শোন। দাঁড়াও তামাক এক-ছিলিম সেজে নিই।"

এই বলিয়া তিনি তামাক সাজিতে লাগিলেন।—এতকাল রেলপথে যাতায়াত করিতেছি, এমন অদ্ভুত মনুষ্যের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। হায় হায়, এমন বক্তা বঙ্গীয় রাজনীতিক্ষেত্রে স্থান পাইল না! মনে করিলাম, একটা বড় সুবিধা হইয়াছে। মধুপুরে ট্রেণটা পৌছে অতি বিশ্রী সময়ে,—ঠিক ঘুমের সময়। ঘুমাইয়া পড়িলে মধুপুর ছাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা। এই বাগ্মী-বরের কল্যাণে জাগিয়া থাকিতে পারিব; নিদ্রাদেবী দূরে থাকিয়া নিজ মান রক্ষা করিবেন।

তামাক সাজিতে সাজিতে বৃদ্ধ বলিলেন—"বাবুর নাম ?"

"মহানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

"আমার নাম শ্রীমদনগোপাল দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়। নিবাস মোল্‌নাইয়ের নিকট ইলছোবা গ্রাম। জেলা বর্দ্ধমান। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান আমরা, নৈকুষ্য কুলীন। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সাত পুত্র ছিলেন—

যজ্ঞেশ্বরের সুত সাত
শঙ্কর জানকীনাথ।

আমরা সেই শঙ্কর জানকীনাথের সন্তান।"

এ বক্তৃতাটি এত সংক্ষিপ্ত হইল তাহার কারণ মদনগোপাল বাবু কলিকায় ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখভাব কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে করুণভাবাপন্ন ছিল—তাহার কারণ বোধ হয় সদ্যপ্রাপ্ত সন্দেশের শোক। এখন বরং একটু গর্ব্বিত দেখাইতে লাগিল; তাহা বোধ হয় কুলগৌরবের স্মৃতিজনিত। যাহা হউক আমি পরম কৌতুকের সহিত লোকটীর পানে চাহিতে লাগিলাম। গাড়ীও বর্দ্ধমানে পৌঁছিল।

আমার চুরুট ফুরাইয়াছিল, নামিয়া হোটেলে গেলাম চুরট কিনিতে। যতক্ষণ গাড়ী ছাড়িবার শেষঘণ্টা না হইল ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

গাড়ী ছাড়িলে দেখিলাম আর সকলে নামিয়া গিয়াছে, শুধু আমরা দুই জনে আছি।

মদনগোপাল বাবু আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন—"তার পর—সদানন্দ বাবু—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"আমার নাম মহানন্দ।"

"ওহো, ঠিক ঠিক। মহানন্দ বাবু কতদূর যাওয়া হবে?"

"মধুপুর।"

"আমি যাব কাশী। তুমি ত এখনি পৌঁছে যাবে হে! দু ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা জোর! আমায় যেতে হবে আজ সমস্ত রাত, কাল সমস্ত দিন। তাইত বলছি কিনা, এই সমস্ত রাত সমস্ত দিন যে গাড়ীতে কাটবে, কি খেয়ে প্রাণধারণ করি?

কাল সন্ধ্যাবেলা কাশী পৌঁছে যাব এখন। কাশীতে আমার মা ঠাকরুণ রয়েছেন কি না। আজ তিন বৎসর তিনি কাশীবাসী। বৃদ্ধ হয়েছেন—বয়স সত্তর বৎসরের উপর হয়েছে। এখনও প্রত্যহ ভোরে উঠে দশাশ্বমেধঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসেন—কি শীত—কি গ্রীষ্ম—কি বর্ষা—কি বাদল। গত ভাদ্র মাস থেকে একটু একটু ঘুস্ ঘুস্ করে জ্বর হচ্চে শুনছি। তাই একবার ভাবলাম দেখে আসি। আছেন ভাল জায়গাতেই—কোন চিন্তার কারণ নেই, তবে কি না কাণে শুনে, সন্তান হয়ে, কি করে চুপ করে থাকি বলুন। আমার গুরুদেবের মধ্যম পুত্রটি কাশীর কলেজে অধ্যাপক, সপরিবারে থাকেন সেখানে, সেই-খানেই আমার মা ঠাকরুণকে রেখে দিয়েছি। গুরু পুত্রটি অতি উপযুক্ত লোক। ন্যায়ে তাঁর সমকক্ষ কাশীতে নেই বল্লেই হয়। আমারই বয়স, একত্র খেলা করতাম। সেই অল্পবয়স থেকেই বুদ্ধির সূক্ষ্মতা দেখা গিয়েছিল।—”

আমি বলিলাম—“মশাই চুরট খান কি ?”

“চুরট ? খাই কখনও কখনও। ছেলেবেলায় যখন কলকাতায় ছিলাম, ইংরিজি পড়তাম, তখন খুবই খেতাম। তখন তোমাদের ও বার্ডসাই ফার্ডসাই ওঠেনি—ভাল চুরট ?”

আমি বলিলাম—“মন্দ নয়, দেখুন না।” বলিয়া আমার সিগার কেস খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তিনি একটি চুরট লইয়া ধরাইয়া লইলেন ; আমিও একটি ধরাইলাম।

গাড়ী তখন রাণীগঞ্জ পার হইয়াছে। দুই ধারে অনেক কয়লার খনি। স্থানে স্থানে স্তূপাকার কয়লায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছে--খুব আলো হইয়াছে। কাছে খোলা ইঁট সাজাইয়া

অস্থায়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কুলীরা বসিয়া আছে—কেহ বা খাদ্য পাক করিতেছে।

আমারও ক্ষুধা পাইয়াছিল। ভাবিলাম এইবেলা কিছু খাইয়া লই। সঙ্গে আমার টিফিন্‌বাস্কেট্ ছিল, তাহাতে বাড়ী হইতে খাবার আনিয়াছিলাম। মদনগোপালবাবুর .জিনিষপত্র সরাইয়া কষ্টে টিফিনবাস্কেট বাহির করিলাম। ভাবিলাম আমি আহার করিব আর আমার এই সহযাত্রীটি অভুক্ত থাকিবেন! অথচ যদি আহ্বান করি তবে খাইবেন কি না তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ আমার এ জিনিষগুলি ঠিক হিন্দু-ধর্ম্মসঙ্গত নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম বলিয়াই দেখি, খান উত্তম,—না খান কি করা যাইবে। টিফিন্‌বাস্কেট্‌টি বেঞ্চের উপর তুলিয়া খুলিয়া বলিলাম—"মদনবাবু—আপনি খাবার যা এনেছিলেন, তা ত গেল। আমার সঙ্গে কিছু খাবার রয়েছে, যদি আপত্তি না থাকে আপনার, তবে দুজনে খাওয়া যায়।"

মদনবাবু আমার বাস্কেটের প্রতি ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রপাত করিয়া বলিলেন—"কি আছে তোমার ওতে ?"

আমি (আঙুল না গণিয়া) বলিলাম—"রুটি আছে, ডিম আছে, দুতিন রকম মাংস আছে, মাখন টাখন আছে।"

"হিন্দু মাংস ? হোটেলের মাংস নয় ত ?"

"মাংস হিন্দু। আমার বাড়ীর ব্রাহ্মণের পাক করা, শুধু রুটিটি হোটেলের,—নইলে আর সব জিনিষ বিশুদ্ধ হিন্দুমতে তৈরি।"

মদনবাবু বলিলেন—"তা হোক, হোটেলের রুটিতে আপত্তি নেই। যখন কলকাতায় ছিলাম, ইংরিজি পড়তাম, তখন

হোটেলের রুটি ঢের খেয়েছি। কত কি খেয়েছি! সে সব দিনে ছাত্র সমাজ ভারি উচ্ছৃঙ্খল ছিল।" বলিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া মাংসাদি বাহির করিয়া প্লেট সাজাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ছুরি কাঁটা ব্যবহার করেন কি?"

"না ভাই, ওসব পোষাবে না। দাও হাতে করেই খাই।"

খাইতে খাইতে মদনগোপাল বাবু হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক এক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সারমত এই যে মুসলমানের হাতে খাইতে নাই এ কথা শাস্ত্রে পাওয়াই যাইতে পারে না; কারণ শাস্ত্র যখন তৈয়ারি হইয়াছিল তখন মুসলমান জন্মগ্রহণই করে নাই। তাহারা যখন আসিয়া আমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তখনি আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ এ প্রকার লোকাচারের প্রবর্ত্তনা করিলাম।

মাংস ফুরাইলে মদন বাবুকে বলিলাম—"রুটি আরও রয়েছে। মাখন আছে, জ্যাম্ আছে, মার্ম্মালেড্ আছে, কি নেবেন?"

মদনগোপাল বাবু বলিলেন—"মার্ম্মালেড্? মার্ম্মালেড?—মার্ম্মালেড্ দাও একটু খেয়ে দেখি—কখনও খাইনি।"

দিলাম। আহারান্তে গেলাসে জল লইয়া জানালার বাহিরে তিনি হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। আবার শালখানি উত্তমরূপে দেহে জড়াইয়া বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া উপবেশন করিলেন।

তাঁহাকে আর একটা চুরট দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি

বলিলেন—"নাঃ—তামাক সাজি। হুঁকো কল্‌কের কাছে কেউ লাগে নারে দাদা!"

তামাক সাজা হইলে আমি বলিলাম—"কৈ মদন বাবু, সেই মোল্‌নাইয়ের গোল্লার গল্পটা বল্লেন না?"

তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলে যাচ্ছিলাম। আমাদের আমলের কথা নয় এ,—আমরা গল্প শুনেছি।—গল্পটা এই। বর্দ্ধমানের মহারাজা, মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খেয়ে ভারি খুসী। তাই মহারাজা হুকুম কর্‌লেন—"মোল্‌নাইয়ের যে প্রধান মোদক, তাকে নিয়ে এস, বর্দ্ধমানে বসে সে গোল্লা তৈরি করুক।" রাজার হুকুম, কি করে, প্রধান মোদক চাটু খুন্তী নিয়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হল। গোল্লা তৈরি করলে, কিন্তু সে রকম স্বাদটী হল না। রাজা বল্লেন—"মোদকের পো, কৈ সে রকম ত হল না!" মোদক যোড়হস্ত করে বল্লে (এইস্থানে মদনগোপাল বাবু স্বয়ং যোড়হাত করিলেন)—'মহারাজ, ভয় কব না নির্ভয় কব?' মহারাজা বল্লেন—'ভয় ছেড়ে নির্ভয় কও'। মোদক বল্লে—"মহারাজ, মোল্‌নাই থেকে আমাকেই নিয়ে এসেছেন, মোল্‌নাইয়ের মাটিও আনতে পারেন নি, মোল্‌নাইয়ের জলও আন্‌তে পারেন নি।" বলিয়া মদনবাবু অত্যন্ত হাসিতে ও কাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসি ও কাসি থামিলেই বলিলেন—"মোল্‌নাইয়ের গোল্লা না খেলে তার মর্ম্ম বুঝতে পারবে না। আচ্ছা আমি কাশী থেকে ফিরে আসি দাঁড়াও। একটা রবিবার কি শনিবার আমাদের এখানে আসতে পার না?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা, তা হলে তোমায় নিমন্ত্রণ করে পাঠাব—এস। ষ্টেশনে গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব,—তোমায় নিয়ে যাবে। পাণ্ডুয়া থেকে ইলছোবা বেশী দূর নয়। মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খাইয়ে দেব,—আর আমাদের দিশী মার্ম্মালেডও খাইয়ে দেব।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"দিশী মার্ম্মালেড্ হয় না কি? তা ত জানিনে।"

মদনগোপাল বাবু হাসিয়া বলিলেন—"অ্যাঃ তুমি নিতান্ত এক-বারে ক্যালকেশিয়ান্! খালের বাইরে আর কোন খবরই রাখ না! ধানের গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছে লাল লাল ফুল হয়, গুঁড়ি চিরে বড় বড় তক্তা হয়।" বলিয়া তিনি পুনশ্চ হাসিতে ও কাসিতে আরম্ভ করিলেন। একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন—"মার্ম্মালেড্, বেলের মোরব্বা গো! কেন, কলকাতাতেও ত পাওয়া যায়।"

আমি চুরটে একটা লম্বা টান টানিয়া বলিলাম—"মাফ করবেন, মার্ম্মালেডের বেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।"

"কিঃ?"

"মার্ম্মালেডের সঙ্গে বেলের কোনও সম্পর্ক নেই।"

"কেন? মার্ম্মালেড্ মানে কি? বেলের মোরব্বা নয়?"

"না।"

"বিলক্ষণ! তুমি বল্লেই শুনব? আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি মার্ম্মালেড্ মানে বেলের মোরব্বা।"

"মাষ্টার আপনাকে ভুলশিক্ষা দিয়েছিল।"

"বেলের মোরব্বা নয় ত কিসের মোরব্বা?"

"যদি মোরব্বাই বলেন ত কমলানেবুর মোরব্বা।"

এই কথা শুনিয়া মদনগোপাল বাবু চমকিয়া উঠিলেন। ভীতস্বরে বলিলেন—"কমলানেবুর মোরব্বা ?"

আমি ভাবিলাম, ব্যাপারখানা কি! বিস্মিত হইয়া বলিলাম —"কমলানেবুর বৈকি!"

"কমলা নেবুর হলে একেবারে মিষ্টি হত। কমলা নেবুর যদি, ত স্বাদ একটু মিষ্টির সঙ্গে কষা কষা কেন ?"

"আমাদের এরকম সাধারণ কমলানেবুর নয়। স্পেনে সেভিলদেশে একরকম কমলানেবু হয়, দেখতে ঠিক এই রকমই, তার স্বাদ একটু কষা। সেই নেবুতে মার্ম্মালেড হয়।"

মদনগোপালবাবুর মুখে ভয়ের স্থানে বিরক্তির চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। বলিলেন—"ঠিক জান তুমি ?" স্বরটি কিছু রুক্ষ।

"ঠিক জানি।"

মদনবাবু আমাকে ভেঙ্গাইয়া বলিলেন—"ঠিক জানি!" অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। ভয়ানক রাগও হইল। বলিলাম— "মশাই, মুখ ভেঙ্গানটা অনেকে ভদ্রতার লক্ষণ বলে মনে করে না।"

বলিয়া আমি জানালার দিকে পিঠ করিয়া, বেঞ্চের উপর পা রাখিয়া কক্ষের ছাদে বাতির পানে চাহিয়া রহিলাম।

মদনগোপালবাবু বলিলেন—"মনে করে না ত রাজা করে! তোমার সঙ্গে কি আমার শত্রুতা ছিল? আমি আজ বিশ বচ্ছর কমলানেবু খাইনি।—তুমি আমায় কি জন্যে কমলানেবু খাইয়ে দিলে ?"

আমি বলিলাম—"কেন? কমলানেবু ত আর বিষাক্ত জিনিষ নয়।"

"তোমার পক্ষে বিষাক্ত জিনিষ না হতে পারে। আমার পক্ষে বিষাক্ত। আমি যখন কমলানেবু খাইনে তখন তুমি কি জন্যে আমায় খাওয়ালে?"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"মশাই কি আগে আমায় সে কথা বলেছিলেন?"

মদনগোপালবাবু আবার মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিলেন—"মশাই কি আগে আমায় সে কথা বলেছিলেন! তুমি কেন সেই সময়ে বল্লেনা যে ওতে কমলানেবু আছে?"

লোকটার ব্যবহার দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন।"

"যাও যাও ঢের দেখেছি তোমার মত কলকাতার বাবু! 'সীমালঙ্ঘন করেছেন!' ভদ্রতা শিক্ষা দিতে এসেছেন! ছুরি কাঁটা দিয়ে মাংস খেতে জানলেই ভদ্রলোক হয় না। একজন নিরীহ ব্যক্তি যা খায় না, তাকে তাই খাইয়ে দেওয়া খুব ভদ্রতা!"

আমি বলিলাম—"ক্ষিধেয় মরছিলেন—নিজের খাবার থেকে খেতে দিলাম, বেশ প্রতিফল তার!"

"ক্ষিধেয় মরছিলাম বৈকি! তোমার কাছে কেঁদে পড়েছিলাম খাবার জন্যে।"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"যা ইচ্ছে হয় বলুন।" বলিয়া আমি কম্বল মুড়ি দিয়া বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম।

বাবুটি অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বর নরম হইয়া আসিতে লাগিল। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে খাবারের হাঁড়ি লোকসানের শোক নুতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন—"খাবারের হাঁড়িটে যদি সঙ্গে থাকত তা হলে ত আর এ বিপত্তি হত না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভাবিলাম লোকটা দেখিতেছি বদ্ধ পাগল! অনেক বকিয়া বকিয়া বোধ হয় শ্রান্তিবোধ হইল; তখন তামাক সাজিতে বসিলেন, শব্দে জানিতে পারিলাম। তাহার পর ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমি কম্বলে মুখ ঢাকিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক খাইলেন। ক্রমে গাড়ী আসিয়া আসানসোলে থামিল। মদনবাবু জানালা দিয়া গলা বাহির করিয়া বলিলেন—"চাপরাশি—ও চাপরাশি।"

কে একজন জানালার কাছে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু, কটা বেজেছে বলতে পার?"

সে বলিল—"সাড়ে এগারোটা বেজেছে।"

"মধুপুরে কখন গাড়ী পৌঁছবে?"

"বারোটা।"

ভাবিলাম, আমার উপর লোকটার এতই ক্রোধ হইয়াছে যে আমি না নামিয়া গেলে—পাপ না বিদায় হইলে—আর সুস্থির হইতে পারিতেছে না।

গাড়ী ছাড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার কম্বলের উপর হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম।

"সদানন্দবাবু—ওঠ।"

আমার নাম সদানন্দ নয়, সুতরাং আমি উত্তর করিলাম না।

"ভায়া—ওঠ। মধুপুর এল বলে। ওঠ—ওঠ।" আমি মুখ হইতে কম্বল খুলিলাম।

"ভায়া, রাগ করেছ?"

আমি উঠিয়া বসিলাম। শুষ্কভাবে বলিলাম—"কেন, সব রাগ কি আপনারই একচেটে না কি?"

ধীরে ধীরে আমার পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"না না রাগ কোরো না। বুড়ো মানুষ, দুটো কথা যদি বলেই থাকি, তাতে কি আর রাগ করতে হয়? হঠাৎ মেজাজটা গরম হয়ে উঠেছিল। সব দোষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল। আমায় মাফ্ কর।"

ভাবিলাম মনুষ্য চরিত্র এই রকমই বটে। এখনও বলিতেছেন, "সব দোষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল।" অর্থাৎ এখনও মনে এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে সবটা না হোক কিছুটা দোষ আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধের স্বর এমন কোমল ও কারুণ্যপূর্ণ যে তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববিরাগ তখনি আমি মন হইতে বিদূরিত করিয়া ফেলিলাম। ক্ষমাসূচক একটু হাস্য করিলাম।

মদনবাবু বলিলেন—"কমলানেবু আমি কেন খাইনে তা যদি তোমায় খুলে বলি ত তুমি বুঝতে পারবে।"

মদনবাবুর মুখচক্ষু যেন কালিমাময়। একটু কাসিয়া বলিলেন—"শুনবে?" তাঁহার স্বর অত্যন্ত নীচু।

আমি বলিলাম—"বলুন।"

তিনি আরম্ভ করিলেন—"সে বিশ বছরের কথা, আমি একটা মানুষ খুন করেছিলাম।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"মানুষ খুন!"

"খুন বৈকি! সে খুনই বলতে গেলে। শোন। দোসরা মাঘ আমার বড়মেয়ের বিয়ে দেব বলে পৌষের শেষে কলকাতায় গিয়েছিলাম বাজার করতে। একটা মেসের বাসায় গিয়ে উঠেছিলাম, সেখানে সব কলেজের ছেলেরা থাকত। কোনও ঘরে জায়গা ছিল না। শুধু একটি ঘরে একটু জায়গা ছিল, সে ঘরে একজন জ্বররোগী পড়েছিল, আর তার শালাও সেই ঘরে থাকত। ভগ্নীপতির নাম কেদার, শালার নাম প্রবোধ। ভগ্নীপতিটি বাঙ্গাল,—বয়স কুড়ি বাইশ হবে। প্রবোধ তার চেয়ে দুই তিন বছরের ছোট ছিল। প্রবোধ কলেজ কামাই করে ভগ্নীপতির খুব সেবাটা করত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়ান, তাপ নেওয়া, মাথায় হাত বুলানো, পায়ে হাত বুলানো, রাত্রে দুবার তিনবার করে উঠত। কদিন ছোকরা খুব লুটোপুটি খেয়ে একদিন কতকটা সুস্থ হল। জ্বরটা অনেক কম দেখা গেল। আমি সেইদিন সন্ধেবেলা বাড়ী যাব। সকালে মাধববাবুর বাজার থেকে ভাল দেখে একশোটা কমলালেবু কিনে আনলাম। প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করলাম—'রুগীমানুষ,—এঘরে নেবুগুলো—।' প্রবোধ বল্লে—'পাগল হয়েছেন! তা কোনও চিন্তা নেই, স্বচ্ছন্দে রাখুন।' রেখে আমি আবার বাজার করতে বেরুলাম, প্রবোধ ভগ্নীপতি একটু ভাল আছে দেখে কদিনের পর কলেজে গেল। সন্ধেবেলা বাসায় এসে দেখি সর্ব্বনাশ হয়েছে আর কি। একা ঘরে লোভ না সামলাতে

পেরে কেদার সতেরোটা নেবু খেয়ে ফেলেছে, জ্বর একবারে বিকারে দাঁড়িয়েছে। বাড়ী যাওয়া ঘুরে গেল; রোগীর সেবা করতে বসলাম। মেয়ের বিয়ের টাকা ভেঙ্গে ভাল ভাল ডাক্তার আনালাম; কলকাতা সহরে যতদুর যা হতে পারে, কিছুর ত্রুটি করলাম না। অনাহারে অনিদ্রায় বসে তিন দিন শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না।" বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিলাম। বাহিরে মহা অন্ধকার; গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ছাদের উপর লণ্ঠনটির আলো ম্রিয়মাণ, পলিতায় গুল জমিয়াছে। গভীর রাত্রে একটি কামরায় আমরা দুইটি প্রাণী বসিয়া! আমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—

"তাতে আপনার অপরাধ কি! আপনি ত আর জেনে শুনে করেন নি! বিশেষতঃ তার শালা যখন ঐ কথা বল্লে—"

"শালা ছেলে মানুষ। আমি তার বাপের বয়সী। সে যে ভুল করলে, আমার সে ভুল করবার কি অধিকার ছিল?"

আমি বলিলাম—"ব্যাপারটা খুব শোচনীয় সন্দেহ নেই। তবু আপনি নিজেকে এর জন্যে যতটা দোষী স্থির করেছেন—সেটা নিতান্ত অনুচিত। পাপের পরিণাম ত কার্য্যের ফলে নয়, কার্য্যপ্রণোদক ইচ্ছায়।"

মদনগোপালবাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"সে কথা বল্লে মন বোঝে না। আমিই এর জন্যে দায়ী। প্রবোধের কান্নাটা যদি দেখতে! সে বল্লে তারা পাঁচ ভাই এক বোন্—ঐ একমাত্র বোন্—কত আদরের বোন্—তেরো বছর মোটে বয়স, তার

এই সর্ব্বনাশ হল!—আমারও মেয়ে তখন তেরো বছরের। বাড়ী গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলাম। আমি আমার মেয়ের পানে চাইতে পারিনে। মেয়েকে দেখলে, সেই যে মেয়েকে দেখিনি যার সর্ব্বনাশ করেছি তারই কথা খালি মনে হয়।"

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। এইবার মধুপুর। বৃদ্ধকে কি সান্ত্বনা দিব? বলিলাম—"মদনগোপালবাবু,—আপনি বৃথা নিজেকে দোষী করেন। জন্ম, মৃত্যু—এ সব ঈশ্বরাধীন ঘটনা, মনুষ্যের অধীন নয়। আপনি আমাদের শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না?"

মদনগোপালবাবু নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল।

গাড়ী থামিল। নিদ্রাতুর খালাসীরা ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"মধুপুর—মধুপুর।" আমি মদনগোপাল বাবুকে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেলাম।

অযোধ্যার উপহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অখিলবাবু কাছারি হইতে বাড়ী আসিবামাত্র গৃহিণী তাঁহাকে অযোধ্যার সকল গুণের কথা বলিয়া দিলেন।

অখিল বাবু সে দিন একটা মোকর্দ্দমা হারিয়া আসিয়াছিলেন। বিপক্ষ উকীল তাঁহাকে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিঁধিয়া দিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার মেজাজটা অত্যন্ত বিগড়িয়া ছিল। তাহার উপর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন এই ব্যাপার! গৃহিণী চক্ষুযুগল জবাবর্ণ ও পক্ষ্মরাজি জলসিক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। অখিল বাবু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। অদূরে একজন ঝি যাইতেছিল, অযোধ্যাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এক মিনিট পরে অযোধ্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার চক্ষু অন্য দিনের মত আনত নহে। গোঁফযোড়াটা সে উত্তমরূপে পাকাইয়া জর্ম্মণ সম্রাটের ন্যায় উর্দ্ধদিকে উঠাইয়া দিয়াছে। তাহার মস্তকে পাগড়ী। বাড়ীতে সচরাচর অযোধ্যা পাগড়ী পরে না,—কিন্তু কোনও কারণে তাহার মেজাজটা যখন অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠে, তখনি সে তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া লয়। মনে বীরত্বের ভাব জাগিয়া উঠিলে বাহিরে তাহার চিহ্ন-প্রকাশের ইচ্ছা স্বাভাবিক।

অযোধ্যার আকার প্রকার দেখিয়া বাবুর ক্রোধবহ্নি আরও প্রখরতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি আত্মস্থ হইয়া শান্তভাবে অথচ কঠোরস্বরে জজের রায় পড়ার মত ধীরে ধীরে বলিলেন—

"অযোধ্যা, তুই অনেক কালের চাকর। কিন্তু পুরোণো হয়ে কোথায় ভাল হবি না যতই বুড়ো হচ্চিস্, ততই তোর বজ্জাতি বাড়ছে। মনিব বলে যে একটা সমীহ কি ভয় ডর তা তোর নেই। হাড় জ্বালাতন করে তুলেছিস্। তুই পুরোণো চাকর বলে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর না। তুই যা। এই পয়লা তারিখ থেকে তোর জবাব দিলাম।"

অযোধ্যা মাথা নাড়িয়া, উদ্ধতভাবে অবজ্ঞাপূর্ণস্বরে উত্তর করিল—"যো হুকুম মহারাজ, হম্ রাজিকা সাথ চলা যায়েঙ্গে। আপ জবাব নেহি দেতেঁ তো খুদ্ হম্ আজ ইস্তাফা দেনেকো তৈয়ার হুয়া থা।" অযোধ্যার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল।

কেহ না মনে করেন যে অযোধ্যা বাঙ্গালা কহিতে জানে না। সে এ বাড়ীতে আঠারো বৎসর চাকরি করিয়াছে—প্রায় বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গলা কহিতে পারে। কিন্তু রাগিলে সে আর বাঙ্গলা কহিত না। বাঙ্গলাভাষাটা ভালমানুষীর ভাষা; তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণুজাতির ভাষা। অযোধ্যা কেন,—অনেক বাঙ্গালীও প্রবল ক্রোধের সময় বাঙ্গলা কহিতে পারেন না—হিন্দী বা ইংরাজী কহিয়া থাকেন।

অযোধ্যার এ দুর্ব্বিনীত উক্তিতেও অখিলবাবু আত্মহারা হইলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীরভাবে বলিলেন—"বেশ। কিন্তু খবরদার, আর যেন এসে যুটিস্‌নে। বার বার তিনবার কসুর

মাফ করেছি—আর করব না। এবার এলে আর কিছুতেই রাখব না। এই শেষ।”

অযোধ্যা বলিল—“নেহি গরীব পরবর, আওর নেহি আও-য়েঙ্গে। হম্‌ভি দিকদারী হো গিয়া—”

তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া, দুয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, ঘূর্ণিত চক্ষে বাবু বলিলেন—“যাও।”

অযোধ্যা যাইতে যাইতে তাহার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করিয়া লইল—“থক্ গিয়া। নোক্রী আওর নেহি করেঙ্গে। যো কিয়া সো কিয়া—বস্ অব্ হদ্ হো চুকা।”

অখিলবাবু চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া ঝিকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে আজ্ঞা করিলেন। অন্যদিন অযোধ্যাই তাঁহার তামাক সাজিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর—চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অখিলবাবু কাছারি গিয়াছেন—ছেলেরা কলেজে—গৃহিণী পালঙ্কে নিদ্রামগ্ন।

আজ শীতটা কিছু বেশী। অযোধ্যা বারান্দায় রৌদ্রে বিছানা টানিয়া একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই আসিতেছে না। খুকী তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাকা-চুল তুলিয়া দিতেছে।

খুকী বলিল—“অযুধা, তুই কেন যাবি ভাই?” অযোধ্যা বলিল—“তোর বাবা যে হামায় ছোড়ায় দিয়েছে ভাই।”

কাল পয়লা তারিখ, অযোধ্যা কাল যাইবে। খুকী জিজ্ঞাসা করিল—“আবার কবে আসবি অযোধ্যা?”

অযোধ্যা বলিল—"আর কেন আসব দিদি ? এবার যাব আর আসব না।"

খুকী অযোধ্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"না অযুধা, তোকে আসতে হবে।"

অযোধ্যা বলিল—"আচ্ছা ভাই, তোর যখন সাদি হবে, তখন তুই হামায় খৎ লিখিস্, হামি আস্‌ব।"

খুকী দুঃখিত স্বরে বলিল—"আমি কি লিখতে জানি ?"

"দাদাবাবুকে বলবি,—দাদাবাবু লিখে দেবে তোর খৎ।"

অযোধ্যা কিয়ৎক্ষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বলিল—"তুই হামার সাদিতে যাবিনে ভাই ?"

খুকী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"দূর পোড়ারমুখো,—তোকে আবার সাদি করবে কে ? তুই যে বুড়ো হয়ে গেছিস্।"

অযোধ্যা বলিল—"দূর পোড়ারমুখী, হামি বুঢ়া হব কেন ?"

অযোধ্যার মাথার চুল পাকাইতে পাকাইতে খুকী বলিল—"না তুই বুড়ো নস্। আমি যেন আর কিছু জানিনে! সে দিন দিদি, মা, সবাই বলছিল!"

"কি বলছিল ?"

"বলছিল অযুধা ড্যাকরার বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে, বলে কি না বিয়ে করব। ওকে কেউ বিয়ে করলে ত ও বিয়ে করবে।"

অযোধ্যা বলিল—"আরে দেখিস্ দেখিস্, যখন সাদি হবে তখন সবাই কি বলে দেখিস্।"

খুকী বলিল—"অযুধা, তুই কেন সাদি করবি ভাই ?"

"নইলে আমায় কে ভাত রেঁধে দেবে দিদি ?"

এই উত্তরে অযোধ্যার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস লুকাইত ছিল। যে তিনবার কর্ম্মচ্যুত হইয়া দেশে গিয়াছিল, পুনরায় যখনি হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল,—আসিয়া বলিয়াছিল,—"হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয় মা, তাই চলে এলাম।" বাল্যকালে অযোধ্যার একবার বিবাহ হইয়াছিল। অযোধ্যা যখন অখিলবাবুর কর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত হয়,—তখন তাহার স্ত্রী জীবিত ছিল, এখন সে বহু বৎসর ধরিয়া বিপত্নীক।

খুকী জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি এবার বিয়ে করবি অযুধা ?"

"সত্যি না ত কি ঝুট্ বলছি ?"

"ক হাজার টাকা পাবি ?"

অযোধ্যা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"টাকা মিল্‌বে কি আউর টাকা দেনে পড়ি রাকুনী! এ কি বাঙ্গালীর সাদি ?"

"গহনাও দিতে হবে ?"

"গহনাভি দেনে পড়ি না ত কি! বহুত রুপিয়া খরচ রে দিদি—বহুত রুপিয়া খরচ" বলিয়া অযোধ্যা পুনরায় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খুকী কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তাহার পর আগ্রহের স্বরে বলিল—"অযুধা, তোর বউকে আমি একটা গহনা দেব।"

অযোধ্যা হাই তুলিয়া বলিল—"কি গহনা দিবি ভাই ?"

খুকী বলিল—"কেন ? আমার পুরাণো বালা রয়েছে সাড়ে তিন ভরির, সে ত আর আমার হাতে হয় না, সেই বালা তোর বউয়ের জন্যে দেব এখন নিয়ে যাস্।"

অযোধ্যা হাসিল। বলিল—"আগে কনিয়া ঠিক হোক্,—তখন বালা দিস্, তাবিজ দিস্, মল দিস্,—সব দিস্।"

খুকী বলিল—"না তুই বালা ঘোড়াটী আমার নিয়ে যা।" বলিয়া তাড়াতাড়ি খুকী উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালা দুইটি আনিয়া বলিল—"রেখে দে এই বেলা। মা উঠলে জানতে পারলে হয় ত দিতে দেবে না।"

অযোধ্যা বলিল—"বালা কোথা থেকে নিয়ে এলি রাক্ষুসী?"

"কেন, বালা কোথায় থাকে আমি জানিনে বুঝি?"

"যা যা বালা যেখানে ছিল রেখে আয়।" বলিয়া অযোধ্যা হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল।

খুকী বালা দুইটি বাজাইয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া গান করিতে লাগিল। অযোধ্যা বলিল—"যা রেখে আয় বলছি, হারিয়ে ফেলবি ত মুস্কিল্ হবে।"

খুকী কোনও কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। অযোধ্যা শেষবার একবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খুকী তাহার মার ঘরে গিয়া দেখিল, মা তখনও নিদ্রিত। পালঙ্কের উপর হইতে তাঁহার রাশিকৃত চুল মেঝেতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

খুকী তাহার পর পূজার ঘরে গিয়া, কোশা হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া, চরণামৃত পান করিল। পান করিয়া, ঘাড়টি বাঁকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিল—আঃ। ঘরের কোণে বিড়ালটা

বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। খুকী পূজার ফুল এক মুঠা লইয়া, আস্তে আস্তে বিড়ালটার কাছে গিয়া, নমো নমো বলিয়া তাহার মাথায় একটি একটি করিয়া ফুল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিড়াল মস্তকে শীতলস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। কাতরতাসূচক একটি "মেও" শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পূজাভঙ্গ হইল দেখিয়া ভক্ত খুকী বিড়ালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ৎক্ষণ ধাবিত হইল। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, কবাটে শিকল দেওয়া রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা টুল বুকে করিয়া আনিয়া দুয়ারের কাছে রাখিল। টুলের উপর উঠিয়া শিকল ধরিয়া টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই খুলিতে পারিল না। তখন নামিয়া ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে বেড়াইতে লাগিল। এক টুকরা কয়লা কুড়াইয়া পাইবামাত্র, তাহার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখা দিল। কয়লাটি লইয়া খুকী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। স্নানের স্থানে অনেকক্ষণ জল পড়ে নাই—বেশ শুকাইয়া ছিল। সেই শুষ্ক স্থানে কয়লাটি দিয়া খুকী কয়েকটা ঘর আঁকিল এবং প্রত্যেক ঘরে একটা করিয়া ক লিখিয়া দিল। তাহার পর, টব হইতে ঘটি করিয়া জল লইয়া, ধীরে ধীরে স্বরচিত চিত্রের উপর ঢালিতে লাগিল। অন্ততঃ বিশ ঘটি জল ঢালিবার পর নিরস্ত হইল। একটু শীতও করিতে লাগিল। তখন খুকী বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। গিয়া দেখিল অযোধ্যা দিব্য নাসিকাধ্বনি করিতেছে।

খুকী আস্তে আস্তে অযোধ্যার বিছানায় বসিল। তাহার কোমরে একটি চাবি বাঁধা ছিল, সাবধানে সেটি খুলিয়া লইল। অযোধ্যার দেবদারু কাঠের বাক্সটি কোথায় থাকিত, তাহা খুকী

জানিত। বাক্সটি খুলিয়া বালা দুইটি আস্তে আস্তে সব জিনিষের নীচে লুকাইয়া রাখিল। অন্যান্য নানা দ্রব্যের মধ্যে সে বাক্সে টিনে বাঁধানো,—পৃষ্ঠদেশে গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত একখানি আর্সি ও একটি কাঠের চিরুণী ছিল। খুকী নিজের চুলটা একটু আঁচড়াইয়া লইল। শেষে বাক্স বন্ধ করিয়া চাবিটি আবার পূর্ব্ব-মত অযোধ্যার কোমরে বাঁধিয়া রাখিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে সকাল সকাল আহার করিয়া, গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, বাবুকে প্রণাম করিয়া, দাদাবাবু ও খুকীর নিকট সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিল। খুকী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—গৃহিণীও বারম্বার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

অযোধ্যার গ্রাম মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে দশ ক্রোশ পথ। মুঙ্গের হইতে একখানি গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া অযোধ্যা বাড়ী গেল।

এই মুঙ্গেরে সে প্রথম অখিল বাবুর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। সে কি আজিকার কথা! অখিল বাবু তখন নূতন আইন পাশ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরে তাঁহার উত্তমরূপ পশার জমিলে তিনি হাইকোর্টে গেলেন। যাইবার দিন এই মুঙ্গের ষ্টেশনে গাড়ী চড়িবার গোলমালে অখিল বাবুর প্রথম পুত্র সতীশ হারাইয়া যায়। কেল্লার ফটকের নিকট অশ্বথ গাছের

নিম্নে দাঁড়াইয়া সতীশ কাঁদিতেছিল, অযোধ্যাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। বাবু খুসী হইয়া তাহাকে নিজের নূতন বিলাতী জুতাযোড়াটা বখ্‌শিশ দিয়াছিলেন। সে সকল কথা মনে পড়িল। তাহার পর সেই সতীশ কলিকাতায় জ্বরবিকারে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। সমানে রাত্রি জাগিয়া একুশ দিন অযোধ্যা সতীশের শুশ্রূষা করিয়াছিল। শবদাহ করিয়া আসিয়া অখিল বাবু অযোধ্যার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—"অযুধা—একবার তুই আমার হারাছেলে খুঁজে দিয়েছিলি,—এবার খুঁজে নিয়ে আয়।"—সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে অষ্টাদশ বৎসর যাহাদের সহিত কাটিয়াছে, তাহাদের সহিত বন্ধন এবার চির-দিনের তরে ছিন্ন হইল। অযোধ্যার গাড়ী অনেক দূর অবধি গঙ্গার ধার দিয়া গেল। পথ যখন বাঁকিল, গঙ্গা দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইলেন,—তখন অযোধ্যা যোড়হস্তে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনের একটা কামনা নিবেদন করিল।

বাড়ী হইতে অনেক মাস অযোধ্যা কোনও পত্রাদি পায় নাই। বাড়ীতে তাহার শুধু এক বৃদ্ধা চাচি ছিল, আর কেহই ছিল না। এত দিন সে চাচি বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াই গিয়াছে, মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে অযোধ্যা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, দরজায় তালা বন্ধ। প্রতিবেশীগৃহে সন্ধান করিতে গেল। শুনিল তাহার চাচি ছয়মাস হইল দেহ-ত্যাগ করিয়াছে।—পাড়ার বিজ্ঞলোকেরা পরামর্শ করিয়া, "অযোধ্যা মাহতো, মকাম কলকত্তা" এই ঠিকানা দিয়া, দামড়ি-লালের দ্বারা তাহাকে (বেয়ারিং) পত্রও লিখাইয়াছিল,—কিন্তু

সে পত্র মাস দুই পরে ফিরিয়া আসে এবং বেচারা দামড়িলালের এক আনা পয়সা জরিমানা দিতে হয়। অযোধ্যাকে তাহারা পরামর্শ দিল, দামড়িলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অযোধ্যা যেন তাহার সেই এক আনা পয়সার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।

চাবি লইয়া অযোধ্যা বাড়ী আসিল। দরজা খুলিয়া দেখিল, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট বড় নানাজাতীয় আগাছা জন্মিয়াছে। ঘর খুলিল,—বহুকাল বন্ধ থাকায় ঘরের মেঝে অত্যন্ত সাঁৎসেঁতে হইয়া গিয়াছে। খাটিয়ার একটা পায়ার আধ-খানা উইপোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। গোটাকতক ইন্দুর ও আরসুলা হঠাৎ আলো দেখিয়া খড় খড় শব্দে পলাইয়া গেল।

অযোধ্যা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, চাবি আবার বন্ধ করিয়া, একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় লইল। কর্ম্ম গিয়াছে—এ কথা তাহাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারিল না;—বলিল, ছুটি লইয়া আসিয়াছি।

তাহারা অযোধ্যাকে অভ্যর্থনা করিয়া তামাক দিল। সে তামাক দুই টান টানিয়াই, খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া, অযোধ্যা হুঁকা নামাইয়া রাখিল। বাবুর বাড়ী অম্বুরীয় তামাক খাইয়া খাইয়া তাহার পরকাল গিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অযোধ্যা মজুর নিযুক্ত করিয়া বাড়ী ঘর দুয়ার পরিষ্কার করাইল। লোকে বলিল অযোধ্যা চাকরি করিয়া আমির হইয়া আসিয়াছে। নহিলে, যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেরা মজুরী করিয়া দেহপাত করিয়াছিল, সে কখনও দিনে দুই আনা হিসাবে মজুর নিযুক্ত করে!

নিজের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া অযোধ্যা অন্নপাক করিল।

আহারান্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া রেড়ীর তেলে প্রদীপ জ্বালাইল। সে ম্লান আলোক দেখিয়া কেবলি তাহার প্রভুগৃহের বিদ্যুৎ আলোক মনে পড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন গেল—মাস কাটিল। পাড়ার লোকে ক্রমাগত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কতদিনের ছুটি, আবার কবে কলিকাতা যাইতে হইবে? সে বলে, এই যাইব এবার দিন কতক পরে। অযোধ্যা একাকী থাকে,—কাহারও সঙ্গে মেশে না। তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রতিবেশিগণকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সহিত হাস্যামোদ করিতে অযোধ্যার প্রবৃত্তিই হয় না। সে নিজের ঘরে নীরবে বসিয়া থাকে,—আর কেবল ভাবে। অখিলবাবুর ছেলেমেয়েগুলিকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছিল,—তাহার মনটি অষ্টপ্রহর কলিকাতার সেই প্রিয় গৃহখানিতে পড়িয়া থাকে।

এইরূপে দুই মাস কাটিলে অযোধ্যা স্থির করিল,—দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখিয়া সকলের সংবাদ আনাইতে হইতেছে। ইংরাজিতে চিঠি লিখাইতে হইবে। গ্রামে কেহ ইংরাজী জানিত না। এ অঞ্চলে ইংরাজি জানিত কেবল খড়কপুরের পোষ্টমাষ্টার। গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ উত্তম গব্যঘৃত সংগ্রহ করিয়া, দুই ক্রোশ দূরে খড়কপুরে গিয়া, পোষ্টমাষ্টারকে উপঢৌকন দিয়া, অযোধ্যা তাহার দ্বারা কলিকাতায় চিঠি লিখাইয়া আসিল।

সপ্তাহ পরে দাদাবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। যে পেয়াদা এ চিঠি আনিয়া অযোধ্যাকে দিল, অযোধ্যা তাহাকে মাচা হইতে একটা বিলাতী কুমড়া পাড়িয়া বখ্‌শিস্ করিয়া

ফেলিল। তৎক্ষণাৎ পাগড়ী বাঁধিয়া খড়কপুরে গিয়া পোষ্ট-মাষ্টারের দ্বারা চিঠি পড়াইল।

দাদাবাবু তাহার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। বাড়ীর সকলে খুসী হইয়াছেন। ৫ই বৈশাখ খুকীর বিবাহ। অযোধ্যার জন্য খুকীর ভারি মন কেমন করে।

চক্ষের জল মুছিয়া অযোধ্যা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাবিল দশটা টাকা মনি অর্ডার করিয়া সে দাদাবাবুকে পাঠাইয়া দিবে,—দাদাবাবু যেন অযোধ্যার হইয়া খুকীর বিবাহে তাহাকে একখানি রঙীন কাপড় কিনিয়া দেন।

টাকা বাহির করিবার জন্য অযোধ্যা বাক্স খুলিল। এ বাক্স সে বাড়ী আসিয়া অবধি একদিনও খুলে নাই। বাক্স খুলিয়া দেখিল, সোণার বালা।

দেখিয়া প্রথমটা সে অবাক্ হইয়া গেল। চিরুণীখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, তাহাতে খুকীর দুইগাছি লম্বা চুল লাগিয়া রহিয়াছে। তখন সমস্ত বুঝিতে পারিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাহার পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইল না। পরদিন সে ঘরে দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

বড়বাজারে তাহার এক পরিচিত মহাজন ছিল। তাহার আড়তে গিয়া অযোধ্যা কয়েক দিবস রহিল। কিছু সোণা কিনিয়া, খুকীর বালা জোড়াটা ভাঙ্গিয়া ভাল করিয়া বড় করিয়া গড়াইয়া লইল।

নিজের জন্তও বস্ত্রাদি খরিদ করিল। একখানি ধুতি হরিদ্রায় রঞ্জিত করিল। গোলাপী রঙের একটি পাগড়ী তৈয়ারি করিল।

উৎসববেশ পরিধান করিয়া, পাতলা লাল কাগজে মুড়িয়া বালা ছগাছি লইয়া, অযোধ্যা ৫ই বৈশাখ অপরাহ্ন সময়ে অখিলবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল।

বাটীর সকলেই তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। খুকী বালা পরিয়া আমোদে আটখানা। অখিল বাবু আসিয়া বলিলেন—"অযুধ্যা তুই আমার চিঠি পেয়েছিস্ ?"

অযোধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"দাদাবাবুর চিঠি ?"

"দাদাবাবুর কেন ? আমার চিঠি। খুকীর বিয়েতে আমি তোকে এক সপ্তাহ হল নেমন্তন্ন করে রেজিষ্টারি চিঠি লিখেছি,—গাড়ীভাড়ার জন্যে দশ টাকার নোট পাঠিয়ে দিয়েছি,—সে তুই পাস নি ?"

গৃহিণী বলিলেন—"ও কি দেশে ছিল নাকি ? ও এই কলকাতায় ছিল, খুকীর জন্যে বালা গড়াচ্ছিল।"

বালার কথা শুনিয়া বাবু রাগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন "তুই গরীব মানুষ খেতে পাস্ নে, অত টাকা খরচ করতে গেলি কেন ? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তোর ?"

অযোধ্যা তখন হাসিয়া হাসিয়া বালার ইতিহাস বলিল।

গৃহিণী বলিলেন—"বটে ! তাই বলি খুকীর পুরোণো বালা-যোড়াটা গেল কোথা ! আলমারিতেই রেখেছিলাম, না সিন্দুকেই ছিল ঠিক করতে পারিনে।"

অখিল বাবু বলিলেন—"তা বেশ। খুকীরই জিৎ।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যা নিজের রঙ্গীন পাগড়ীটি খুলিয়া সন্তর্পণে উঠাইয়া রাখিয়া বিবাহ বাড়ীর কার্য্যে মাতিয়া গেল।

বলবান জামাতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নলিনীবাবু আলিপুরের পোষ্টমাষ্টার। বেলা অবসান প্রায়, আপিসে বসিয়া নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিনমাস,—সম্মুখে পূজা,—নলিনীবাবু ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড্ আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবেন। জিনিষপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটীর হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"yes"।

কিন্তু হায়, ছুটীর হুকুম আসিল না। একটা মনি অর্ডার সম্বন্ধে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকী টাকী কার্য্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্ব্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখীর ছবি)

নিম্নে সোণার জলে মুদ্রিত—

"যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্য আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটী হইলেই শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটী হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ, ভুল না।

তোমারই

সরোজিনী।

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটীর কোনও সম্ভাবনা আর দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটী আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সক্ষম হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আর যখন দুই এক মিনিট বাকী আছে, তখন আবার টেলিফোনের কল ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন "yes"।

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনী বাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইহাঁর আসিবার কথা পূর্ব্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সেই জন্যই বিশেষতঃ এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। 'দিনাজপুরে মেজদি'র উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে,—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি বুঝাইতে হইলে মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহবাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মহা সাহেব লোক,—তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। মেজদির নামটি উল্লেখ করিলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশতঃ ফুলার সাহেব বাঙ্গলা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহার আইডিয়াল্ সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও কার জন্যে এনেছিস ?"

"নিজে মাখব।"

"দূর—ও জিনিষ ত কেবল স্ত্রীলোক আর বাবুতে মাখে ;—পুরুষমানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে ?"

বালক দেবরটি, বড়দিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভাল মানুষের মত বলিয়াছিল,—"কেন ? বাবুরা কি পুরুষ নয় ?"

নলিনী বাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্ত্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের ছিল। গাল দুইটি টেবো টেবো, হাত দুখানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনার দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র বাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :—

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম।

যেমন কোমল, তেমনি বিকল,
তেমনি আলস্য ধাম,
নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরীমুখনিঃসৃত হয়, এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনী বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবার কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোষ্ট আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ঈজি চেয়ারে পড়িয়া, নলিনী বাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মৎলবের উদয় হইল। কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন,—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তত্তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না,—ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্ত্তি আরও অধিক মাত্রায় পরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়িকামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া, হংস, বন্যশূকরাদি শিকার করিতেও অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপ করিয়া দুই বৎসর কাটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে; ফলতঃ তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত। হায়, নামটাও যদি পরিবর্ত্তন করিবার উপায় থাকিত! নলিনী বাবু মনে করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন—খুব একটা ভীষণ রকমের—কি নাম রাখিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনী বাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটি বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিষপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটীতে কিঞ্চিৎ শিকারও করিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কৈ, কেহ ত তাঁহাকে লইতে আসে নাই। গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে

তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি আনায় টেলিগ্রাম একটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছে নাই না কি?

কুলী ডাকিয়া, জিনিষপত্র লইয়া, নলিনী বাবু ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মহেন্দ্র বাবু উকীলকা বাসা জান্‌তা?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল,—"হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই; এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটা বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্ব্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিম্নে, বামে, একটা কূপ; সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমী ভৃত্য সজোরে একটা কটাহ মাজিতেছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনী বাবু বলিলেন:—

"এই মহেন্দ্র বাবু উকীলের বাড়ী?"

"হাঁ বাবু।"

"বাবু আছেন?"

"না। তিনি কিদার বাবু উকীলের বাড়ী পাশা খেল্‌তে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা,—ভিতরে খবর দাও,—বল জামাই বাবু এসেছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল,

সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল,—"ওগো, তোমাদের জামাই বাবু এসেছেন।"

ভৃত্যটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া, এক মুখ হাসিয়া বলিল—"আরে! জামাই বাবু?" বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশরণ জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। এদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের বালকবালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনী বাবুকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল,—"বাবু, চান করা হোবে কি?"

নলিনী বলিল,—"হাঁ—স্নান ক'রব। তুমি গোসলখানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"ভাল ছিলেন ত?"

"হাঁ, ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে?"

হাসিয়া ঝি বলিল,—"যেমন রেখেছেন। আজ ছ'মাস আমি এ বাড়ীতে চাকরী কর্‌ছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, 'জামাই বাবু কবে আসবেন গো?'—'জামাই বাবু কবে আস্‌বেন গো?'—দিদিমণি বলেন, এই ছুটী হ'লেই আস্‌বেন। তা' এত দিনে মনে পড়ল সেও ভাল। আপনি চান করে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হ'বে?"

নলিনী মোগলসরাই ষ্টেশনে, কেলনারের কল্যাণে, প্রাতরাশ

সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন; বলিলেন—"এখন ভাত চড়াতে হবে না,—জলটল কিছু খাব এখন।"

ঝি বলিল,—"আচ্ছা, তবে চান করে ফেলুন। পরে, আপনাকে একটি নতুন জিনিষ দেখাব। আমার বখ্‌শিসের জন্যে কি গহনা-টহনা এনেছেন বের করে রাখুন।"—বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণী-জন-সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল,—"তুই বখ্‌শিস্ লিবি; আমি বুঝি বখ্‌শিস্ লেব না?"

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালকবালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব্বকথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্প কয়েক মাস বয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে কে বুরুষ করিয়া দিয়াছে।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া, তুলিয়া, নাচাইয়া, বলিল—"দেখ জামাই বাবু দেখ, কেমন সোণার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি

ভদ্রতার খাতিরে বলিল—"বাঃ—বেশ ছেলেটি ত!"—বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল—"বেশ ছেলেটি বল্লেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখ্‌বে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধ-মুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল—"ওমা, ওমা ওকি! লোকে বলবে কি গো! রূপো দিয়ে সোণার চাঁদের মুখ দেখা?"

সমবেত বালকবালিকাগণ খিল খিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল—"সোণা ত আনি নি।" মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও?

ঝি বলিল—"সে কথা শোনে কে? তা হ'লে আজই সেকরা ডেকে সোণার গহনার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ হ'লেই হয় না!"

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। "ছেলের বাপ হ'লেই হয় না" ইহার অর্থ কি? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ না কি?

শিশুকে ঝির কোলে ফিরিয়া দিয়া, সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"ছেলেটি কবে হ'ল?"

ঝি পুনর্ব্বার গালে হাত দিয়া বলিল—"অবাক্ কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার নোককে জিজ্ঞাসা করছ?"

যে দুইটি বালকবালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালকবালিকাগণ তাহাদের দেখা দেখি, উচ্চতর স্বরে হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে, মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময় একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল—"জামাই বাবু! একটু সরবত খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত, পর্দ্দা অপসৃত করিয়া রামশরণ ভৃত্য বলিল—"বাবু আসুন—জল খাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দর মহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে রূপার রেকাবী বাটী গেলাসে ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী

ধীরে ধীরে আসনখানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুম ঝুম শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল—"মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল। কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জী এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে পরন্তু তাহা সুপুষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। "কি ভাই, এতদিন পরে মনে পড়ল?" বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা একমুহূর্ত্তের জন্ম মাত্র। চারিচক্ষে মিলিত হইলেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল—

"কি লো, পালিয়ে এলি যে?"

"ওমা, ওযে অন্য লোক।"

"অন্ত লোক কি লো! আমাদের শরৎ নয়?"

"না, শরৎ হ'বে কেন?"

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"একি কাণ্ড ? ছুঁয়োচোর না কি ?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয়।"

"ওমা একি কাণ্ড ! কে এল ?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—"একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ!—ওমা কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো। ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেলি। যা, শীগ্‌গির বাবুকে খবর দে।"—রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর আর কিছু নলিনী শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান পুস্তক রহিয়াছে; প্রত্যেকখানির নিম্নে সোণার জলে নাম লেখা—এম, এন্, ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে ভ্রমক্রমে সে অন্য লোকের শ্বশুর বাড়ীতে চড়াও করিয়াছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে, নিশ্চিন্ত মনে, একে একে জলখাবারের বাটীগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামশরণ ভৃত্য উর্দ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদার বাবু উকীলের বাসায়, ছুটীর সময়, প্রায়ই পাশাখেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন।

পাশাখেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল—"বাবু—বাবু—জলদি বাড়ী আসুন—"

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া, ভীত হইয়া, মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন—"কেন রে—কারু অসুখ বিসুখ।"

"বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে।"

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন—"ডাকু? দিনের বেলায় ডাকু?"

রামশরণ বলিল—"ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি পাগল আদমি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হামি বাবুর দামাদ আছি।"

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন এল? কি করছে?"

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। মাইজি লোককো বড়া ডর হয়েছে।"

"বন্দুক এনেছে? লাঠি এনেছে?—হতভাগা পাজি শূয়ার—তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায়?" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্র বাবু বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁকিলেন—"জোর সে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকীল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয় পাগল হ'বে।" কেহ বলিলেন, "না—পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোন বদমায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্র বাবু (নলিনীর শ্বশুর) বলিয়া দিলেন—"পাগলই হোক গুণ্ডাই হোক, ধরে পুলিসে হাণ্ডোভার করে দিও।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল। বাড়ীতে পৌঁছিলে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—"কই, কোথায়?"

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"আপনিই মহেন্দ্র বাবু? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমাপ্রর্থনা করবার আছে।"

নলিনীর ভাব ভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় মহেন্দ্র বাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে আপনি?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। মহেন্দ্র বাবু উকীলের বাড়ী গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জান্‌তে পেরেছি। এতক্ষণ

চলে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে,—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবে যাব এই জন্যে অপেক্ষা করেছি।”

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাতখানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন।

শেষে বলিলেন—“মহিনের জামাই তুমি! বেশ বেশ। দেখ, এখানে দুজন মহেন্দ্র বাবু উকীল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয় ত মফঃস্বল থেকে কোনও উকীল আমার কাছে এক মোকর্দ্দমা পাঠিয়ে দিলে, মক্কেল কাগজ নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার শ্বশুর বাড়ীতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম।” বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিত হাস্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনীকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্প গুজবের পর, নলিনীর জন্য একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায়গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে কেদারবাবু উকীলের বাড়ীতে, সে অপরাহ্ণে পাশাখেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সেই সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্য্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকীলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ী ফিরিয়া চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। আপিস কক্ষে ইজি চেয়ারে বসিয়া, চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া, আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকীলের বাড়ী, কত লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে—"এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী ?"

"হাঁ বাবু।"

"খবর দাও, বল বাবুর দামাদ এসেছেন।"

এই "দামাদ" শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টি হস্তে যণ্ডামার্ক আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ীর ভিতর হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন—"কোই হ্যায় রে ?" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলিলেন—"পাজি বেটা জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো। ঘুরেফিরে

শেষ আমার বাড়ীতে এসেছ? শ্বশুর পাতাবার আর লোক পেলে না! বেটা বদমায়েস গুণ্ডা!"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দরোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন—"মারকে নিকাল দেও। গর্দান পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল—"খবরদার। হাম চলা যাতা হ্যায়। লেকেন যো হামকো ছুয়েগা, উসকা হাড্ডি হাম চূর চূর কর ডালেঙ্গে।"

নলিনীর মূর্ত্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

একথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এরকম গুণ্ডার মত চেহারা?—ভাগো হিঁয়াসে—নিকলো হিঁয়াসে—নয় ত আভি পুলিসমে ভেজেঙ্গে"—

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"চলো ষ্টেশন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্র বাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—"মদ খেয়েছ না কি? জামাইকে তাড়ালে?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"জামাই কাকে বল? সে একটা জুয়াচোর।"

"জুয়াচোর কিসে জান্‌লে?"

তখন মহেন্দ্রবাবু, পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সবই বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন—"বেশ ত, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর? দুজনেরই এক নাম,—বাড়ী ভুল করে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য্য?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এ সকল কথা ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অবসরই পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"সে যদি হ'ত—তা হলে খবর দিয়ে আসত,—আমরা ষ্টেশনে তাকে আনতে যেতাম। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ কখনও জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়? সেটা জুয়াচোর—জুয়াচোর।"

"কেন আসবার কথা থাকবে না—আসবার কথা ত রয়েছে।

পুজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি,—তবে ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন—"ওগো সে নলিনী নয়—আমি তাকে দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তুই দেখেছিস না কি? বল ত—বল ত! কোথা থেকে দেখলি?"

"যখন ঐ গোলমালটা হ'ল, আমি দোতালায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদের ননীর পুঁতুল। এ ত দেখলাম একটা কাটখোট্টা জোয়ান।"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"ঠিক বলেছিস্। আমি ত সে কথা তার মুখের উপরেই বলে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে? তার কি অমন কাশীর গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্য নধর বাবু বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একদিন মাত্র দেখেছি বটে,—তা' বলে এমনিই কি ভুল হয়?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—"বাবু, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকার চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন—"খবর কি?"

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—"এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে দেখছি জামাই—ই বটে।"

গৃহিণী বলিলেন—"তবে এখন ফেরাবার কি উপায় হয়?"

"যাই, নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল ষ্টেশনে চল। এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ী নেই। বোধ হয় ষ্টেশনে গিয়ে বসে আছে। যাই গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি।"

* * * * *

বাড়ীর লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালী-শালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সে কথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত—তাহাই নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি-পূরণ হইয়াছিল। একদিন কেবল অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকীলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক্ পরের শ্বশুর-বাড়ীতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম,—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুরবাড়ীতে উঠে পায় না।"

খুড়া-মহাশয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শরতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বড় ঘরের বারান্দায় মাছুর পাতিয়া বসিয়া গগন চক্রবর্ত্তী তামাক খাইতেছেন। ঘরের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি পীড়িত, এখনি ডাক্তার আসিবার কথা আছে।

ইঁহারা দুই ভাই, নবীন ও গগন। গ্রামটি নৈহাটির নিকট চন্দ্রদেবপুর। ইঁহারা এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু শুনা যায় নাকি, বৃদ্ধ নবীনের হাতে নগদ দশহাজার টাকা আছে। কেহ বলে ইহা বাজে গুজব, কেহ বলে ইহা সত্য কথা। কিন্তু কেহই সে টাকা স্বচক্ষে দেখে নাই। সে টাকা যে লোহার সিন্দুকটিতে আছে অথবা নাই, সেই সিন্দুকটিমাত্র সকলে দেখিয়াছে। সেটি বৃদ্ধের শয়নকক্ষে অবস্থিত। বৃদ্ধ সর্ব্বদাই সেই ঘরে থাকিয়া সিন্দুকটি আগ্‌লাইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র নবকুমার পশ্চিমে চাকরি করে, সে অনেকবার পিতাকে স্বীয় কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও যান নাই। সকলে বলে, তিনি সিন্দুকটি ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

গগন চক্রবর্ত্তী বসিয়া-বসিয়া নীরবে তামাক খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ডাক্তারবাবুর লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িল।

ডাক্তারবাবু আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"চক্রবর্ত্তিমশাই, খবর কি?"

চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি নামাইয়া বলিলেন—"ডাক্তারবাবু? এস। খবর ভাল। এখনত বেহুঁস রয়েছেন,—বড্ড জ্বরটা রয়েছে কি না। কিন্তু নাড়ী বেশ চল্‌ছে এখনও। উঠে এস—একবার দেখ না।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া আসিলেন। চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দুয়ার খুলিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। পিল্‌সুজের উপর একটি মাটীর প্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। একখানি লম্বা ও চওড়া তক্তপোষের উপর মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধরোগী নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ সাবিত্রী পায়ে হাত বুলাইতেছে।

ইঁহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাবিত্রী ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। গগন চক্রবর্ত্তী প্রদীপটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধের নাড়ি পরীক্ষা করিলেন,—থার্ম্মিটার্ দিয়া উষ্ণতা লইলেন। পরীক্ষান্তে বলিলেন—"এখনও খুব জ্বর। সে ফিবার-মিক্‌শ্চারটা খাওয়ান হচ্চে?"

সাবিত্রী তাহার ঘোম্‌টাবৃত মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, হইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন—"আজ সারারাত্রি ওটা দেওয়া হোক্। ভোরের দিকে রিমিশন্ হবার সম্ভাবনা।"

বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিলেন। গগনচন্দ্রও তাঁহার সহিত দরজা অবধি যাইলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবুকে খবর দিয়েছেন ?"

"নাঃ, দিই নি। কিছু ভাবনা নেই, দাদা ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেন। ওরকম ত হয়ই ওঁর মাঝে মাঝে। নবুকে খবর দিলেই এখনই খরচ পত্র করে' বাড়ী আস্‌বে—তাই খবর দিই নি।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"গতিক বড় ভাল বোধ হচ্চে না কিন্তু। আজ পাঁচ-পাঁচ দিন জ্বরটা ছাড়্‌ল না,—ভারি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন। জ্বর ছাড়্‌বার সময় সাম্‌লাতে পার্‌লে হয়।"

গগন বলিলেন—"আরে না না। আমি এতকাল দেখ্‌ছি। কিছু ভয় নেই।"

"দেখা যাক। অনেক বয়সটা হয়েছে কি না, তাই ভয় হয়।" বলিয়া ডাক্তারবাবু মৃদুমন্দপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবুর কথাই সত্য হইল,—ভোরবেলায় প্রাণবায়ু বৃদ্ধের দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই এক মিনিটের জন্য মাত্র তাঁহার চেতনা হইয়াছিল। তখন তিনি শুধু বলিয়াছিলেন—"নবু—নবু এসেছে ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিলে, পাড়ার লোক দুইটি-একটি করিয়া আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই বলিল—"তা বেশ গেছেন, খুব গেছেন। বয়স হয়েছিল,—তোমাদের সব রেখে গেছেন,—এ ত ওঁর সৌভাগ্য। তবে নবু কাছে থাকলেই ভাল হ'ত।"

সৎকারের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। সেথানে সত্য-চরণ নামে একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিল,—সে নবকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু। তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্র বলিলেন—"তুমি বাবা গিয়ে নবুকে একখানি টেলিগ্রাপ্ করে' দাও। আমার আর হাত-পা আ'স্‌ছে না।"

সত্যচরণ বলিল—"আচ্ছা, আমি আপিস্ যাবার সময় ষ্টেশন্ থেকে টেলিগ্রাপ্ করে' দেব এখন।" সত্যচরণ কলিকাতায় চাকরি করে—রোজ নয়টার ট্রেণে আপিস যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে দিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে সকলে দুগ্ধাদি পান করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিল। গগনচন্দ্র বিপত্নীক। তিনি একা একঘরে শয়ন করিয়াছিলেন। অনেক রাত্রি হইল,—গৃহের কুত্রাপি আর কোন সাড়াশব্দ নাই—কেবল গগনচন্দ্র তাঁহার শয্যায় এপাশ-ওপাশ করিতেছেন। শোকটা ইঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছে বুঝি? ইহা শোক, না আতঙ্ক?—দুইটি নিকটসম্পর্কীয় বৃদ্ধের মধ্যে একটি মরিলে, অপরটির সহজেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়;—তাঁহার মনে হয়, এইবার আমার পালা ত আসিল।

যাহা হউক, ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গগনচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে, অতি সন্তর্পণে, নিজের ঘরের খিলটি খুলিয়া, নগ্নপদে বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জমাট অন্ধকার,—তাহার উপর আকাশে

মেষ করিয়াছে। মাঠের প্রান্তে শৃগাল একটা ডাকিয়া উঠিল। গগনচন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া-থাকিয়া, ধীরে ধীরে বড় ঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে ঘরে গতরাত্রে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে,—সে ঘরটি আজ তালাবন্ধ। গগনচন্দ্র নিঃশব্দে তালাটা খুলিয়া সেই অন্ধকারঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাঁহার বুকটা দুর্‌দুর্ করিয়া উঠিল। হায় ভ্রাতৃস্নেহ!—এতরাত্রে নিদ্রাহীনচক্ষে ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতার মৃত্যুশয্যাটি একবার দেখিবার জন্য ও অশ্রুপাত করিবার জন্য আসিয়াছেন!

গগনচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সাবধানতার সহিত ঘরের দুয়ারটি প্রথমে বন্ধ করিয়া-দিয়া একটি দিয়াশলাই জ্বালিলেন। প্রদীপটি জ্বালিয়া, পূর্ব্বকথিত লোহার সিন্ধুকটির নিকট অগ্রসর হইলেন। সিন্ধুকটির উপর হইতে একটি ভাঙ্গা কাঠের হাতবাক্স, একখানি ছিন্ন মহাভারত ও কয়েকটি খালি ঔষধের শিশি নামাইয়া, সিন্ধুকটি খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি কাপড়ের পুঁটুলি তাহা হইতে নামাইবার পর, নীচের দিক্ হইতে পুরাতন-লালচেলী-বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির হইল। সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়াবন্দি অনেক নোট্ রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র, সেই ক্ষীণালোকে, সেই মৃত্যুকক্ষে গগনচন্দ্রের মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে শুভ্র দন্তপংক্তির ছটা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্বরিতহস্তে পুঁটুলিগুলি যথাস্থানে পুনঃসন্নিবিষ্ট করিয়া, গগনচন্দ্র সিন্ধুকটি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাভারত ও ভাঙা বাক্স ও ঔষধের শিশিগুলি তাহার উপর পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া-রাখিয়া,

প্রদীপ নিবাইয়া, দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া, নিজ শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুয়ারটি বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া, গগনচন্দ্র শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। বালিশের নিম্নে তাঁহার চশ্‌মার খোলটি ছিল। চশ্‌মাটি চক্ষে লাগাইয়া, নোটের তাড়াগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—কেবল দশটাকার নোট্,—একখানিও নম্বরওয়ারি নোট্ তাহাতে ছিল না। একটি তাড়া খুলিয়া নোট্‌গুলি সাবধানে গণনা করিয়া দেখিলেন,—একশতখানি আছে,—হাজার টাকা। প্রত্যেক তাড়াটি খুলিয়া একে একে গণনা করিলেন, প্রত্যেকটিতেই হাজার টাকা করিয়া। এরূপ দশটি তাড়া ছিল—দশহাজার টাকা।

একবার গণিয়া তৃপ্তি হইল না,—গগনচন্দ্র নোট্‌গুলি বারংবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভোর হইয়া পড়িল। তখন তিনি পুঁটুলিটি নিজের সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, ঘরের বাহিরে আসিলেন।

দুই একটা কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—অল্প অল্প আলো হইয়াছে। গাড়ুটি হাতে করিয়া, বাটীর বাহির হইয়া, আমবাগানের ভিতর দিয়া গগনচন্দ্র পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখনও কোথাও জনমনুষ্যের দেখা নাই। প্রথমেই গগনচন্দ্র, দাদার লোহার সিন্ধুকের চাবিটি, জোরে ছুড়িয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ুতে জল ভরিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইদিন বেলা নয়টার সময় প্রবাস হইতে সন্তঃপিতৃহীন নবকুমার বাটী আসিয়া পৌছিল। সে ইতিমধ্যেই নিজের সাধারণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া কাচা পরিয়াছে, পদ নগ্ন করিয়া আসিয়াছে।

নবকুমারের বাড়ী পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সকলে বলিল—"নবু, কেঁদনা বাবা, চুপ কর। বাপ-মা কি আর লোকের চিরদিন থাকে? এই তোমার খুড়ামশায় রয়েছেন, ইনিই এখন তোমার বাপ হলেন। চুপ কর বাবা।"

প্রতিবেশীরা গৃহ ত্যাগ করিবার সময় পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল,—"আহা,—গগন চক্রবর্ত্তী বুড়োর চেহারাটা কি হ'য়ে গেছে দেখেছ একদিনে!" চোখটোখ সব একেবারে বসে' গেছে।"

একজন বলিল—"আহা, ভাইয়ের শোকটা বড় লেগেছে বামুনের।"—চক্ষুবসার আসল কারণ যে সারারাত্রি জাগরণ ও মনের অঙ্গনে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

যথাসময়ে নবকুমার খুড়ামহাশয়ের সহিত বসিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিল। ভোজনান্তে গগনচন্দ্র মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাঁহার কাছে বসিয়া ছিল।

খুড়ামহাশয় বলিলেন—"শ্রাদ্ধশান্তির ত আয়োজন এইবেলা থেকে কর্‌তে হবে! টাকাকড়ি কিছু এনেছ?"

নবকুমার বলিল—"টাকাকড়ি আমি কোথায় পাব? বাবার সিন্ধুক থেকে কিছু বেরুতে পারে বোধ হয়।"

"তা দেখ—যদি কিছু থাকে।"

"চাবিটা?"

"চাবি? চাবি কোথায়, তা ত বল্‌তে পারি নে।—হয়ত বউমাকে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

নবকুমার গিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। সাবিত্রী বলিল—"আমাকে ত দিয়ে যান নি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কোমরের ঘুন্‌সীতে ছিল দেখেছি। খুড়োমশায় হয়ত খুলে নিয়ে থাক্‌বেন।"

"না,—উনি ত বল্লেন—চাবি কোথায়, কিছুই জানেন না।"

নবকুমার ফিরিয়া-আসিয়া খুড়ামহাশয়কে এই কথা বলিল। তিনি বলিলেন—"তাঁর কোমরে ছিল! তা ত লক্ষ্য করিনি। তবে হয় ত তাঁর সঙ্গে চিতায় উঠেছে।"

নবকুমার একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিল—"ওটা আপনি লক্ষ্য কর্‌লেন না?"

খুড়ামশায় হুঁকা নামাইয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন—"আরে বাবা—সে সময় কি আমার চাবি-সিন্ধুক-টাকাকড়ি ভাব্‌বার মত মনের অবস্থা ছিল? সে সব তোমরা পার।"

নবকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। খুড়ামহাশয় ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে নবকুমার বলিল—"তবে এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? কামার ডাকিয়ে সিন্ধুক খোলাতে হবে।"

কামার ডাকাইয়া সিন্ধুক খোলান হইল। তাহা হইতে কেবল গুটিত্রিশেক নগদ টাকা আর নবকুমারের পরলোকগতা জননীর খানকয়েক সোনা ও রূপার পুরাতন অলঙ্কার বাহির হইল।

ইহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারও বরাবর মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাহার পিতার সিন্ধুকে নগদ দশহাজার টাকা আছে। তাহার মনে বিশ্বাস হইল, খুড়া-মহাশয়ই সে টাকা সরাইয়াছেন। অথচ তাহার সাক্ষিসাবুদ কিছুই নাই।

খোলা সিন্ধুকের সম্মুখে নবকুমার বসিয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় খুড়ামহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু পেলে?"

সিন্ধুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল—"দশহাজার টাকা ছিল যে, কোথা গেল?"

গগনচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কত টাকা?"

"দশহাজার।"

খুড়ামহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন—"দশহাজার টাকা! পাগল! কোথা পাবেন তিনি?"

নবকুমার বলিল—"কেন, সকলেই ত বল্‌ত, এই সিন্ধুকে তাঁর দশহাজার টাকা আছে।"

"সকলে ত সব জানে। কেন, দাদা ত সর্ব্বদাই বল্‌তেন,

তাঁর এক পয়সাও নেই। তুমি পশ্চিম থেকে যা টাকাকড়ি পাঠাতে, মাঝে মাঝে তাই খরচপত্র করতেন, আর দু-পাঁচ টাকা জমিয়েছিলেন। হ্যাঁঃ—দশহাজার টাকা! দশহাজার টাকা কি সাধারণ কথা রে বাবা!”

নবকুমার আর কি করিবে। নীরবে মনের সন্দেহ ও রাগ হজম করিয়া, যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই তাহার ছুটি ফুরাইল,—ভগ্নহৃদয় লইয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদিন তাহার পিতার সেবাশুশ্রূষার জন্য স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সাবিত্রীকে সে পশ্চিমে লইয়া নিজের কাছে রাখিবে। স্ত্রীকে বলিয়া গেল, পূজার ছুটি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, পূজার সময় আসিয়া, তাহাকে লইয়া যাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পুরাতন গহনাগুলি বিক্রয় করিবে, কিছু কাপড় চোপড়ও কিনিবার প্রয়োজন আছে। সারাদিন বউবাজার ও বড়বাজারে ঘুরিয়া আড়াইশত টাকায় গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেটবুকে নোট্ ছিল, টাকা দিবার জন্য পকেটবুক বাহির করিতে যাইয়া দেখে;—পকেটবুক নাই—জুয়াচোরে কখন্ চুরি করিয়াছে, জানিতে পারে নাই।

বিপদের উপর বিপদ্! সেই পকেটবুকে তাহার রিটারন্

টিকিটখানি পর্য্যন্ত ছিল,—আড়াইশত টাকার নোট্ ছিল,—খানকতক পুরাতন চিঠিপত্র ছিল—সব গিয়াছে!

দোকানের কাপড় দোকানে রাখিয়া, নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ পঞ্জাব-মেলে সে কর্ম্মস্থানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল,—এমন টাকা নাই যে, নূতন টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আপিসে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া কোনরকমে নবকুমার বাসায় রাত্রিযাপন করিল।

প্রভাতে, তখনও নবকুমার শয্যাত্যাগ করে নাই,—বাসার একটি মোটা বাবু একখানি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন—"নবকুমারবাবু, দেখুন, ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যেই করেন। কাল যে আপনার পকেটবুক চুরি হয়েছিল, সেটা একটা খুব মঙ্গল বল্‌তে হবে।"

নবকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কেন, ব্যাপারটা কি?"

স্থূলকলেবর যুবকটি সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিলেন—"গতরাত্রে পঞ্জাব-মেল্ আশান্-শোলের নিকট পৌঁছিলে একটি মালগাড়ির সঙ্গে ভীষণ কলিশন্ হইয়া যায়। দুই তিনখানি যাত্রিগাড়ি চূর্ণ হইয়াছে। ড্রাইভার অত্যন্ত আহত হইয়া হাঁসঃপাতালে আছে। যাত্রিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সাংঘাতিক রকম আহত। মৃতের তালিকা—"

মৃতের তালিকার মধ্যে "নবকুমার চক্রবর্ত্তী"র নামও পাওয়া গেল।

স্থূলবাবুটি বলিলেন—"কি রকম? আপনিও মরেছেন নাকি?"

নবকুমার বলিল—"বোধ হয় আমার নামের অন্য কেউ?"

যুবকটি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি নবকুমারবাবুর ভূত নন ত? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।" বলিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

এ কথা শুনিয়া নবকুমারের মস্তিষ্কে দুই-একটা কথার উদয় হইল।—সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া, আশান্‌শোলে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া পুলিস্ আফিসে সন্ধান লইল। জিজ্ঞাসা করিল—"একজন নবকুমার চক্রবর্ত্তী বলে' যে মরেছে—আপানারা তাঁর নাম জান্‌লেন কি করে'?"

দারোগা বলিল—"তার পকেট্ থেকে এই পকেট্‌বুক্‌টি বেরিয়েছে।"

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেট্‌বুক্—তাহাতে তাহার নোট্, চিঠি, রিটারন্‌টিকিট, সবই রহিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই;—সেই জুয়াচোরই তবে মারা পড়িয়াছে। পাপের এরূপ হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

"আমি নবকুমারের একজন বন্ধু।"

"লাশের কি হবে? অ্যাক্‌সিডেণ্টের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ্ করেছি। লাশের আত্মীয়েরা এসে কেউ জালাবার বন্দোবস্ত করে ত করবে,নইলে আমরা পুঁতে ফেল্‌ব।"

নবকুমার একবার ভাবিল,—পুঁতিয়াই ফেলুক। তাহার মস্তকে এই সময়ে একটা মৎলব পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়ামহাশয় আসেন, ত লাস দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নহি।

দারোগার নিকট লাশ জ্বালাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল --"আর এ টাকাকড়ি? লাশের ওয়ারিশান্ কে?"

"লাশের এক স্ত্রী আছে, খুড়া আছে। স্ত্রী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে আসিয়া টাকা লইয়া যাইবে।"

দারোগা খুড়ার ঠিকানাদি নোট্ করিয়া লইল। লাশ জ্বালাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্থূলবাবুটী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন --"কি মশাই? খবর কি?"

নবকুমার গম্ভীরভাবে বলিল—"গিয়ে দেখ্লাম,—আমি নই,—আর একজনই মরেছে বটে!"

বাবুটি বলিলেন—"তবু ভাল।"

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শুনিল, যদিও পল্লিগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটীর লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকাল,—গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পাড়ার দুইচারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধ যেমন ঘটা করিয়া হয়, যুবকের শ্রাদ্ধ সেরূপ হয় না। গগনচন্দ্র আশানশোল হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার নোট্ আনিয়াছিলেন,—তাহারই মধ্যে হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাকী দুইশত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন সধবা ছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার যে একটা সুনাম ছিল, সংপ্রতি তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, সেইদিনমাত্র সে অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিয়াছিল। রাত্রে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। পরদিন হইতে সে মুখখানি বিমর্ষ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার কিছুই দেখা যায় না। প্রায় রোজই দ্বিপ্রহরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়। এ অবস্থায় এরূপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? এরূপ অস্বাভাবিক বালবিধবা ত হিন্দুগৃহে প্রায় দেখা যায় না।

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হুঁকাটি নিয়মিতরূপে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে মাঝে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছেন—"সংসার অনিত্য, সকলই মায়া!"

নবকুমার একবার ভাবিল,—পুঁতিয়াই ফেলুক। তাহার মস্তকে এই সময়ে একটা মৎলব পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়ামহাশয় আসেন, ত লাস দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নহি।

দারোগার নিকট লাশ জ্বালাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল —"আর এ টাকাকড়ি ? লাশের ওয়ারিশান্ কে ?"

"লাশের এক স্ত্রী আছে, খুড়া আছে। স্ত্রী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে আসিয়া টাকা লইয়া যাইবে।"

দারোগা খুড়ার ঠিকানাদি নোট্ করিয়া লইল। লাশ জ্বালাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্থূলবাবুটী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি মশাই ? খবর কি ?"

নবকুমার গম্ভীরভাবে বলিল —"গিয়ে দেখ্লাম,—আমি নই,—আর একজনই মরেছে বটে !"

বাবুটি বলিলেন —"তবু ভাল।"

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শুনিল, যদিও পল্লিগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটীর লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকাল,—গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতে-ছেন। পাড়ার দুইচারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধ যেমন ঘটা করিয়া হয়, যুবকের শ্রাদ্ধ সেরূপ হয় না। গগনচন্দ্র আশানশোল হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার নোট্ আনিয়াছিলেন,—তাহারই মধ্যে হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাকী দুইশত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন সধবা ছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার যে একটা সুনাম ছিল,—সংপ্রতি তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, সেইদিনমাত্র সে অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিয়াছিল। রাত্রে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। পরদিন হইতে সে মুখখানি বিমর্ষ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার কিছুই দেখা যায় না। প্রায় রোজই দ্বিপ্রহরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়। এ অবস্থায় এরূপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? এরূপ অস্বাভাবিক বালবিধবা ত হিন্দুগৃহে প্রায় দেখা যায় না।

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হুঁকাটি নিয়মিতরূপে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে মাঝে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছেন—"সংসার অনিত্য, সকলই মায়া!"

কেহ বলিতেছেন,—"আহা নবকুমার বড় ভালছেলে ছিল ;—আজকালকার দিনে ওরকম প্রায় দেখা যায় না।"

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্ত পরে, বাড়ীর চাকর চিনিবাস, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া, বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু দুইবার বলিল—"কত্তা—কত্তা।" তাহার মুখে আর কোন বাক্যনিঃসরণ হইল না,—লোকটা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জল দিয়া, তাহাকে পাখা করিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। ক্রমে লোকটা সুস্থ হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে চিনিবাস, অমন কর্‌লি কেন?"

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বলিল—"রাম রাম রাম! ভূত—কত্তা।"

উহার মধ্যে যে বৃদ্ধটি বাল্যকালে কিঞ্চিৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"দের বেটা চাষা—ভূত কি? ভূত আছে নাকি?"

চিনিবাস চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"ভূত নাই! ঐ পুকুরধারে বাঁশতলায় দেখগা ঠাকুর।"

অনেক প্রশ্নাদির পর ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বলিল, কিছু পূর্ব্বে যখন সে পুকুরে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুরের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের তলায় অন্ধকারে দেখিল—আপাদমস্তক শাদা-কাপড়ে ঢাকা একটা-কি বেড়াইতেছে।

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পদার্থটা কাছে আসিল,—ঠিক ৺নবকুমারের মত চেহারা,—আর বলিল—"ওঁরে চিঁনে,—এঁকবার খুঁড়োমশায়কেঁ ডেঁকে দিতে পাঁরিস্?"—তাহা শুনিবামাত্র চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথরবাটী সেখানে আছাড়িয়া ফেলিয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খুড়ামহাশয় রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"ঠিক দেখেছিস্?"

"ঠিক না ত কি বেঠিক দেখেছি কর্ত্তা। ওরে বাবারে, আর আমি সন্ধেবেলা বাসন মাজ্‌তে যাব না।"

পূর্ব্বোক্ত নাস্তিকপ্রকৃতির বৃদ্ধটি বলিলেন—"চক্রবর্ত্তিমশায়, ঐ কথা আপনি বিশ্বাস কর্‌ছেন? বেটা অসাবধানে বাসনগুলো ভেঙে ফেলেছে—তাই এসে ঐ কথাটা ওজর কর্‌ছে।"—কিন্তু বক্তার হৃদয়ের ভিতরটা গোপনে দুর্‌দুর্ করিতে লাগিল।

সে সন্ধ্যা ত কাটিল। তাহার পর, তিনচারিদিন ধরিয়া, পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া গগনচক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দীঘির ধারে, কেহ ভাঙ্গা শিবমন্দিরের নিকট, কেহ অন্য কোথাও, "নবকুমারকে" দেখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বৃদ্ধটিকে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইতে দেখা যায় না। অন্যান্য বৃদ্ধেরা গগনচক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"শাস্ত্র ত মিথ্যে হবার নয়। অপঘাতমৃত্যুটো হ'ল কিনা,—ও-রকম ত হবারই কথা। বছরটা পুরুক, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ডি দিইয়ে দাও; উদ্ধার হ'য়ে যাবেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর খুড়ামহাশয় পুষ্করিণীর তীর হইতে মুখ

ধুইয়া, জলভরা গাড়ুটি হাতে করিয়া, আমবাগানের ভিতর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা এক শ্বেতবস্ত্রপরিহিত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র সে বলিল—"খুঁড়োমশায়,—সেঁ দঁশহাঁজার টাঁকা—"

আর শুনিবার পূর্ব্বে, খুড়ামহাশয় সেইখানে গাড়ু আছাড়িয়া-ফেলিয়া "রাম রাম" শব্দ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইলেন।

পরদিন অনাবস্থা,—সন্ধ্যার পর খুড়ামহাশয় আর বাটীর বাহির হইলেন না। রাত্রি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন,—রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গাত্রে কাহার অতি শীতল হস্তস্পর্শে খুড়ামহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। খুড়ামহাশয় চম্‌কিয়া ঘুমের ঘোরে বলিলেন—"কে—ও ?"

অন্ধকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল—"আমি নঁবকুঁমার।"

শুনিবামাত্র খুড়ামহাশয়ের ঘুমের ঘোর চট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

ভূত বলিল—"সেঁ দঁশহাঁজার টাঁকা আমার বঁউকে যঁতদিন না দিঁচ্চ—তঁতদিন রোঁজ আঁস্‌ব তাঁগাদা কঁর্‌তে—রোঁজ আঁস্‌ব—রোঁজ আঁস্‌ব—রোঁজ আঁস্‌ব।"

বলিয়া নবকুমার চুপ করিল—ভূতটি যে কে, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবশ্য বুঝিয়াছেন। খুড়ামহাশয়ের নিশ্বাস তখন ঘনঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন খোলা জানালার কাছে গিয়া,

তাহার একটি গরাদে কৌশলে সরাইয়া, নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। বাহিরে কিয়দ্দূরে সত্যচরণ অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যচরণ আপিস হইতে ফিরিয়া-আসিয়া নবকুমারকে সংবাদ দিল,—খুড়ামহাশয় তাহারই ট্রেণে কলিকাতায় গিয়াছিলেন,—সাবিত্রীর নামে দশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এ টাকা কোথা থেকে এল ?"

গগনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"টাকাটা ছিল আমার দাদার। সকলে যে বল্‌ত, তাঁর দশহাজার টাকা আছে—তা দেখ্‌ছি মিথ্যা নয়। কিন্তু তাঁর লোয়ার সিন্দুক থেকে বেরোয় নি। কাল্‌কে রাত্রে হঠাৎ তাঁর একটা পুরোণো টিনের বাক্স খুলে দেখি, একটুক্‌রো লাল চেলীতে মোড়া দশহাজার টাকার নোট্‌। দেখে আমার, হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল আর কি! আহা, আজ যদি নবু বেঁচে থাক্‌ত!—পিতৃধন! যা হোক, বিধবাটার উপায় হ'ল।"

ইহার পর নবকুমার কলিকাতায় গিয়া খুড়ামহাশয়কে এক চিঠি লিখিল। লিখিল, সে শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুর একটা গুজব উঠিয়াছে এবং শ্রাদ্ধশান্তিও হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বাস্তবিক সে বাঁচিয়া আছে এবং একটু কার্য্য উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গিয়াছিল। অমুক তারিখে সে বাড়ী আসিবে এবং একদিন থাকিয়া স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিম যাত্রা করিবে।

নবকুমার বাটী আসিয়া শুনিল, খুড়া মহাশয় কি-একটা জরুরি কার্য্য উপলক্ষ্যে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। স্ত্রীকে লইয়া সে পশ্চিম চলিয়া গেল।

গুরুজনের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার চৌধুরী হুগলির সিভিল্ সার্জ্জন্ স্বরূপ বদলি হইয়া আসিবার মাস দুই পরেই শুনা গেল, কলেজের অধ্যাপক রজনী বাবুর সহিত তাঁহার কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হইবে।

ইহার কিছু দিন পরেই দেখা গেল, রবিবার ও অন্যান্য ছুটীর দিন প্রভাতে, এই দুইটী নবীন প্রণয়ী, দুইখানি বাইসিক্লে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়।

প্রভা ও রজনী হুগলির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের ভিতর দিয়া চক্রচালনা করিয়া তত্তৎ গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর মেয়েকে বাইসিক্লে দেখিয়া বৃদ্ধেরা মন্তব্য করিল ঠিক এতদিনে ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে;—নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা পরামর্শ করিয়া, ঘটনাটির উপর বিলক্ষণ রঙ দিয়া,—সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইল;—আর যুবতীরা ঘোমটার আড়াল হইতে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, পরস্পরকে বলিতে লাগিল—"ধন্যি মেয়ে বটে।"—কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্যাদি প্রভা ও রজনীর কর্ণগোচর হইবার কোনই সুযোগ ছিল না;—তাহারা কেবল পরস্পরের বিরল সঙ্গসুখ উপভোগ করিতেই ব্যস্ত রহিয়া গেল।

এইরূপ করিয়া আরও মাস দুই কাটিয়াছে। বিবাহের দিন-

স্থির হইয়াছে ইংরাজি নববর্ষের দিন,—১লা জানুয়ারি। ডাক্তার চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল বিবাহ হুগলিতেই সম্পন্ন হয়,—কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ইচ্ছা তাহা নহে। তাঁহার ইচ্ছা, কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ হয়। নহিলে আমোদ উৎসবের সুযোগ পাওয়া যাইবে না। ডাক্তার চৌধুরী প্রথমে ক্ষীণভাবে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিলেন,—বলিলেন কলিকাতায় গেলে খরচ পত্র অনেক বেশী হইয়া যাইবে, ইত্যাদি। কিন্তু গৃহিণী সে আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। সর্ব্বত্র যাহা হয়—গৃহিণীর মতই বজায় রহিয়া গেল,—কর্ত্তাকে পরাস্ত মানিতে হইল।

কলিকাতায় গিয়া বিবাহ হইবে শুনিয়া কিন্তু প্রভা ও রজনী একটি অভিনব পরামর্শ করিয়া বসিয়াছে। তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনই বিপজ্জনক। তাহারা পরামর্শ করিয়াছে, ঐ দিন প্রভাতে, অন্যান্য সকলের সঙ্গে রেলে কলিকাতায় না গিয়া,—দুইজনে একাকী বাইসিক্লে যাত্রা করিবে। কিন্তু অভিভাবকেরা এ কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রভা ও রজনীর উপস্থিতিকালে পারিবারিক সভায় এ বিষয়ের একদিন আলোচনা হইল। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রভার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। তখন সকলে রজনীকে বলিল—"আচ্ছা প্রভা না হয় ছেলেমানুষ, তুমি কি বল?"—হায়, প্রেমটা এমনই জিনিষ,—তাহাতে পড়িলে কলেজের অধ্যাপকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়। রজনী একটু হাসিয়া বলিল—"আপনারা যে রকম বিপদ আশঙ্কা করছেন, তার কোনও কারণ নেই। গঙ্গার ধার দিয়ে বরাবর ভাল রাস্তা আছে। শীতের সকালবেলা রোদ্দুরেও প্রভার কোনও কষ্ট হবার ভয় নেই।"

প্রভার মা বলিলেন—"আচ্ছা কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই যেন, কিন্তু তোমরা কি ঠিক সময়ে পৌঁছিতে পারবে? কখনো পারবে না। এখান থেকে দধিমঙ্গল করে বেরুতে হবে। কলকাতায় গিয়ে গায়ে হলুদের বন্দোবস্ত। নটা দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে পারবে? কখনো পারবে না। ও সব মৎলব ছেড়ে দাও।"

বলিয়া রাখি, যদিও ইহাঁরা নব্যতন্ত্রের লোক, তথাপি বিবাহে আপত্তিবিহীন সনাতন আচারগুলি রক্ষা করিতে সমুৎসুক। দধিমঙ্গলে শাঁখ বাজাইবার জন্য কলিকাতা হইতে প্রভার দিদি নলিনী সংপ্রতি এখানে আসিয়াছেন।

রজনী বলিল—"কলকাতা এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল বৈ ত নয়,—নটা দশটার অনেক আগে আমরা পৌঁছতে পারব।"

নলিনী বলিলেন—"গুরুজনের কথা না শোন কাণে,—শেষকালে অনুতাপ করতে হবে দেখো।"

ইহা শুনিয়া প্রভা তাহার দিদির প্রতি কটু মট্ করিয়া সরোষ নেত্রপাত করিল। তাহার চক্ষে যদি সংপ্রতি জলের পরিবর্ত্তে অগ্নি থাকিত তবে দিদি অবিলম্বে ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ক্রমে সকলের মত হইয়া গেল। প্রভারও সজলচক্ষে আবার হাসি দেখা দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ নববর্ষ, আজ প্রভা ও রঞ্জনীর বিবাহ। ভোরবেলা চৌধুরী পরিবারের সকলে জাগিয়া উঠিয়াছেন। এখনি দধিমঙ্গল হইবে। প্রথমে অনেক আপত্তি সত্ত্বেও রজনীও আসিয়া এই-খানে প্রভার সহিত দধিমঙ্গল খাইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

সমস্ত প্রস্তুত। রজনী আসিলেই হয়। ক্রমে বাহিরের অন্ধকার হইতে চক্রের শব্দ এবং ঘণ্টার ঠুং ঠুং ধ্বনি আসিল।

মুহূর্ত্ত পরেই রজনী আসিয়া প্রবেশ করিল। সে তাহার জিনিষ পত্র ভৃত্য হস্তে রেলে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

নলিনী পরিহাস করিয়া বলিলেন—"আগে বর কনের দধি-মঙ্গল আলাদা আলাদা হত।"

প্রভার মা বলিলেন—"তুই ত জিদ্ করে বেচারিকে আনালি। এখন আবার ঠাট্টা করছিস্ কেন?"

রজনী বলিল—"দেখুন ত একবার অন্যায়। উনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লেন—'আমার বিয়ের সময় আমাকে একলা দধিমঙ্গল খেতে হয়েছিল; সে দুঃখ আমার এখনও মনে আছে। আমার ত দিদি ছিল না। প্রভাকে দিয়ে আমার সে সাধ পূর্ণ হোক।' এখন এই কথা বলছেন!"

নলিনী শুনিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আমি বলেছি? কখন বল্লাম তোমায়?"

"আপনি বলেন নি?"

"কখনো না।"

"তা না হতে পারে। কিন্তু তখন আপনার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, আপনার মনের ভিতর ঠিক ঐ রকম ভাবটা জাগছে।"

শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। নলিনী বলিলেন,— "তোমার ত আশ্চর্য্য ক্ষমতা। মানুষের মুখ দেখে তার মনের কথা বলতে পার না কি?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা আমার মনে এখন কি কথা হচ্চে বল দেখি?" বলিয়া নলিনী মুখখানি পরম গম্ভীর করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী গম্ভীরতর ভাবে, পকেট হইতে তাহার চসমা খানি বাহির করিয়া, চক্ষে লাগাইল। পরে অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে, ঝুঁকিয়া, নলিনীর মুখখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শেষে বলিল—"ভয় কব, কি নির্ভয় কব?"

"ভয় ছেড়ে নির্ভয় কও।"

"আপনার মনে হচ্চে, কতক্ষণে কলকাতায় পৌঁছবেন,— কতক্ষণে একটি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।"

(নলিনীর স্বামী তখন কলিকাতায় ছিলেন।)

নলিনী বলিলেন—"ভুল। আমার মনে হচ্ছিল তুমি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ।"

রজনী অত্যন্ত বিনয়ের ভাণ করিয়া বলিল,—"আহা অযথা আমায় অত কেন বাড়িয়ে তোলেন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র।"

আবার হাসি পড়িয়া গেল। এইরূপ হাস্যামোদের মধ্যে দধিমঙ্গল সমাপ্ত হইল।

তখন ভোর পাঁচটা। ছয়টার সময় ট্রেণ ছাড়িবে,—সেই ট্রেণে সকলে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বাহিরে ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সকলে প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভার মা রঞ্জনাকে বলিলেন—

"খুব সাবধানে যাবে তোমরা। পথে যেন কোন বিপদ ঘটিও না বাছা। আর, খুব সকাল সকাল পৌঁছতে হবে। বেলা ৮টার বেশী দেরী না হয়। কলকাতায় গিয়ে তবে গায়ে হলুদ হবে। তোমাদের বাড়ী থেকে তেল আসবে, মাছ আসবে, ক্ষীর আসবে, তবে সেই তেল হলুদ মেখে প্রভা স্নান করবে,—সেই ক্ষীর, মাছ প্রভা খাবে। আর, পথে যেন কিছু খেও না; গায়ে হলুদের আগে কিছু খেতে নেই।"

নলিনী বলিলেন—"খালি তেল হলুদ ক্ষীর মাছ আসবে কেন? তার সঙ্গে সঙ্গে রজনীও আসুক না।"

রঞ্জনা বলিলেন—"ফাউস্বরূপ না কি?"

নলিনী বলিলেন—"না;—বাহক হয়ে। বক্‌শিস্ পাবে।"

হাস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁরা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখনও প্রভার মা জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিতেছেন—"খুব সাবধানে যাবে।" নলিনীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"গুরুজনের কথা না শুন কাণে—।" আর শুনা গেল না। গাড়ী ফটকের বাহিরে গিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমে আলো হইতে লাগিল। রজনীকে একাকী রাখিয়া প্রভা যাত্রার জন্য সজ্জিত হইতে গেল। কয়েক মিনিট পরে দুইখানি বাইসিক্ল লইয়া দুইজনে বারান্দার নিম্নে বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও আলোকের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। বাগানে দেশী বিলাতী অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে,—দূরের ফুল তখনও ভাল নজর হয় না। তাহাদের মিশ্রিত সৌরভটুকু অনুভব করা যায় মাত্র। প্রভা ও রজনী কয়েক মুহূর্ত্ত একাকী এই বাগানে দাঁড়াইয়া রহিল।

যাত্রার পূর্ব্বে সস্নেহে রজনী প্রভার দুইটি হস্ত নিজ হস্ত-যুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বলিল—"প্রভা,—আজ আমরা কোথা যাচ্চি ?"

প্রভার মনে উত্তর জাগিল—"সুখসাগরে স্নান করিতে"—কিন্তু লজ্জায় সে কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু সমীপস্থিত একটী গাছ হইতে একটী শিশিরসিক্ত নবস্ফুট গোলাপ তুলিয়া রজনীর কোটে লাগাইয়া দিল। রজনী ধন্যবাদ দেওয়ার হিসাবে স্বীয় প্রিয়তমার আরক্তিম ওষ্ঠপুটে একটী চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

তখন আরও একটু আলো হইয়াছে। আকাশ ধূসরতা পরিত্যাগ করিয়া নীলাভ হইয়া আসিতেছে। বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া দুইজনে যাত্রা করিল।

হুগলি সহরের সীমানা অতিক্রম করিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। এ পথে পূর্ব্বে ইহারা কতবার গিয়াছে—তবে কখনও পাঁচ সাত মাইলের বেশী যায় নাই। বেশ শীত করিতে লাগিল। বাইসিক্ল দুইখানি দ্রুতভাবে পাশাপাশি যাইতেছে।

পথের দুইধারে তরুগুল্মের সারি। বামে মাঝে মাঝে গঙ্গা দেখা যায়। দক্ষিণে মাঠ। খানিকটা মাঠ,—তাহার পরেই রেলওয়ে লাইন। কিয়ৎক্ষণ পরে সশব্দে কলিকাতাভিমুখী প্যাসেঞ্জার ট্রেণ বাহির হইয়া গেল। তাহাতে প্রভার পিতামাতা প্রভৃতি ছিলেন, কিন্তু কাহারও মুখ দেখা গেল না।

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল,—তখন শীতক্লেশ অনেকটা নিবারিত হইল। এখন ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের ভ্রমিত পথের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে দুই একটী করিয়া লোকসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। দুই একখানি গোরুর গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রেলওয়ে লাইন আর দেখা যায় না। পথ গঙ্গার সন্নিকট দিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণপার্শ্বে দূরে বৃক্ষাবলীর মধ্যে কোনও গ্রামের মন্দিরচূড়া জাগিয়া উঠে, আবার দেখিতে দেখিতে তাহা দ্রুতগামী আরোহিদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়া যায়।

ক্রমে সূর্য্য উচ্চে উঠিল, বেশ রৌদ্র হইল। কিন্তু এখন একটু অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। ঠিক সম্মুখে সূর্য্য। উত্তাপে প্রভার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। এ সম্ভাবিত অসুবিধাটির কথা কিন্তু পূর্ব্বে প্রভা বা রজনী কাহারও মনে হয় নাই। নবপ্রণয়ীরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কবেই বা কার্য্য করিয়া থাকে ?

যখন অনুমান পনেরো যোল মাইল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখন সম্মুখ রৌদ্রে প্রভার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। রজনী বেশ বুঝিতে পারিল যে প্রভার কষ্ট হইতেছে কিন্তু প্রভা তাহা স্বীকার করিবে না। স্বীকার করিলেই বা উপায় কি?

কিন্তু প্রভার যখন অত্যন্ত পিপাসা পাইল,—তখন আর প্রভা থাকিতে পারিল না,—রজনীকে বলিল। পার্শ্বেই গঙ্গা। রজনী প্রস্তাব করিল,—এইখানে থামিয়া, গঙ্গাতীরে গিয়া তাহারা উভয়ে জলপান করিয়া আসিবে। পথে একজন রাখালবালক চলিতেছিল, বকশিসের লোভে সে বাইসিক্ল দুইখানা আগলাইতে সম্মত হইল।

প্রভা ও রজনী বাইসিক্ল হইতে অবতরণ করিয়া, গঙ্গা-তীরাভিমুখে চলিল। রাস্তা হইতে নামিয়া শস্যক্ষেত্র---মধ্যে সরু আল পথ। গঙ্গার ঠিক তীরের উপর আমের বাগান।

ঘাটে পৌঁছিয়া, ঠিক সেইখানটাতেই জল খাইবার সুবিধা হইল না। একটুকু ওদিকে সরিয়া যাইতে হইল। সেখানে একটা বৃহৎ পাথর অর্দ্ধজলমগ্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহার উপর বসিয়া প্রভা ও রজনী মুখে হাতে জল দিয়া শ্রান্তি দূর করিল। অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গার সেই নির্ম্মল জল পান করিয়া বাঁচিল।

ঈষৎ বায়ু সঞ্চারে গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গায়িত। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। ওপারে একটী গ্রাম দেখা যাইতেছে। দুই একখানি জেলে-নৌকা নাচিতে নাচিতে অনেকদূর দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রান্তি দূর হইলে প্রভা ও রজনী ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন

করিল। যেখান দিয়া নামিয়াছিল, সেইখান দিয়া উঠিয়া, নির্জ্জন আমবাগানের মধ্যে দিয়া চলিতে লাগিল। অনেকগুলি গাছে আম্রমুকুল ধরিয়াছে—তাহার মদিরগন্ধে বাতাস পরিপ্লাবিত। আমবাগানের পরেই শস্যক্ষেত্র। একদিকে কড়াইশুঁটির ক্ষেত, অপর দিকে সরিষা। সরু আলপথ দিয়া দুইজনে বাহুসম্বদ্ধ হইয়া চলিয়াছে; দাঁড়াইয়া কড়াইশুঁটির ক্ষেতের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া, রজনী বলিল—"দেখ, ফুলগুলি কেমন সুন্দর দেখাচ্চে।"

প্রভা বলিল—"চমৎকার।"

"আমি অনেক সময় ভাবি, এমন সুন্দর ফুল আমাদের কাব্যে কেন কখনও স্থান পায় নি।"

প্রভা বলিল—"ইংরাজি কাব্যে ত দেখা যায়, সুইট্‌পীজ্‌। আমাদের কাব্যে যে সকল ফুলের আদর বেশী, সবই গন্ধযুক্ত ফুল। গন্ধ নেই বলে এ ফুল আমাদের কাব্যে অনাদৃত।"

রজনী বলিল—"আবার দেখা যায়, রূপের কোনও ভাণ নেই, শুধু গন্ধের জোরে ফুল কাব্যে স্থান পেয়েছে—যেমন বকুল।"

এইরূপ গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে প্রণয়িদ্বয় চলিল। পথের কাছে একথোলো মটরশুঁটি ফলিয়াছিল, প্রভা কয়েকটি তুলিয়া নিজে খাইল এবং রজনীকেও খাওয়াইয়া দিল।

যখন ইহারা রাস্তায় উঠিল, তখন যাহা দেখিল, তাহাতে দুইজনেরই চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

রাখালবালক পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহার

নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে। প্রভার বাইসিক্লখানি শুধু আছে, রজনীর খানি নাই।

রাখাল বলিল—একটা পল্টনের গোরা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একখানা বাইসিক্ল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। সে বাধা দিতে গিয়াছিল বলিয়া তাহার নাসিকার উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গিয়াছে।

রজনী উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ দিকে গেল?"

রাখাল অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া হুগলির দিকের পথ দেখাইয়া দিল। আরও বলিল, সে অধিকক্ষণ যায় নাই, এইমাত্র গিয়াছে।

রজনী প্রভাকে বলিল—"তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখি।" বলিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে, প্রভার বাইসিক্ল আরোহণ করিয়া, তীরবৎ বেগে সেই দিকে ছুটিল।

একমিনিট দুই মিনিট—তিন মিনিট, বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া, শেষে দূরে বাইসিক্লচোরকে দেখিতে পাইল। লাল কোর্ত্তা পরা মূর্ত্তি, বাইসিক্ল ছুটাইয়া চলিয়াছে।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া, দ্বিগুণ বেগে রজনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। ক্রমে নিকটে, আরও নিকটে আসিয়া পড়িল। গোরাটা বোধ হয় নিজেকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিরাপদ মনে করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়াছিল। রজনী ইংরাজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"থাম্ বদমায়েস্।"

এই অপ্রত্যাশিত শব্দে গোরাটা তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। চালনাকার্য্যে অপটুতা বশতই হউক, অথবা পথে ইষ্টকাদির বাধাপ্রাপ্ত হইয়াই হউক, সে তৎক্ষণাৎ বাইসিক্লসুদ্ধ মহাশব্দে পথে পড়িয়া গেল।

রজনী তাহার বাইসিক্ল পথে ফেলিয়া রাখিয়া, কয়েক লম্ফ দিয়া ব্যাঘ্রের মত সেই গোরাটার কাছে আসিয়া পড়িল।

সেই নরাকার বৃটিশ বন্যজন্তুটি সেইমাত্র পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রজনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার উপর পড়িয়া অবিশ্রান্ত ঘুসি ও লাথির চোটে তাহাকে পুনশ্চ ভূমিশায়ী করিয়া ফেলিল।

গোরা মাটিতে পড়িলে রজনী দেখিল তাহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইতেছে। তখন তাহার মনে হইল, ইহা ঠিক ন্যায়যুদ্ধ হইতেছে না,—উহাকে প্রস্তুত হইবার জন্য সময় দেওয়া উচিত। ইহা ভাবিয়া রজনী আক্রমণ হইতে বিরত থাকিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গোরাটা আবার ঝাড়িয়া উঠিল। রজনী বলিল—“প্রস্তুত ?”

রজনীর সেই জিমন্যাষ্টিক করা ডাম্বেল ভাঁজা বদ্ধমুষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গোরাটা বলিল—“থাক্—যথেষ্ট হইয়াছে। ক্ষমা কর। শুনিয়াছিলাম বাবুর বাইসিক্ল। বাবুদের মধ্যে এমন কেহ আছে তাহা জানিতাম না।” বলিয়া লোকটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হুগলি অভিমুখে রওনা হইল।

এতক্ষণ রজনী অপহৃত বাইসিক্লটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পায় নাই। এখন দেখিল, চক্রদ্বয়ের যোজক দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া বাইসিক্ল দুইখান হইয়া গিয়াছে। চাকাও স্থানে স্থানে বাঁকিয়া গিয়াছে।

রজনী কিয়ৎক্ষণ সেইখানে থাকিয়া বাইসিক্লটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। পথ দিয়া একজন কৃষক যাইতেছিল, তাহাকে

বলিল—"চাকা দুখানা কাঁধে করে খানিক দূরে নিয়ে যেতে পারিস্? বক্শিস্ পাবি।"

সে স্বীকার হইল। রজনী তাহাকে বলিল—"তুই নিয়ে আয়। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে রাস্তার যে পাকা শাঁকো আছে—আমি সেইখানে থাকব।" বলিয়া রজনী বাইসিক্ল ছুটাইয়া প্রভার নিকট পৌঁছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রভা তখন শাঁকোর উপর একখানি রুমাল বিছাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রাখালবালক গঙ্গা হইতে নাক মুখ ধুইয়া আসিয়াছে—প্রভা তাহাকে চক্লেট দিয়াছে। সে তাহাই খাইতেছে।

রজনী পৌঁছিয়া সংক্ষেপে সমস্ত জানাইল। প্রভা দেখিল রজনীর ভ্রূ কুঞ্চিত, মন অত্যন্ত বিষণ্ণ। প্রভা তখন নিপুণা গৃহিণীর মত রজনীর মন হইতে বিরক্তি ও চিন্তা অপনোদন করিতে যত্নবতী হইল। সে হাসিয়া বলিল,—"তার জন্যে অত ভাবনা কেন?"

রজনী বলিল—"এখন কলকাতায় পৌঁছবার কি উপায়?"

প্রভা বলিল—"কেন? রেলে যাব আমরা। এখান থেকে রেল ত বেশী দূর হবে না। পরের ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে উঠিগে চল।"

রজনী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল—"এখান থেকে রেলের ষ্টেশন কাছে কোথায় আছে?"

চকলেটপূর্ণ মুখে রাখাল বলিল—"ইষ্টিশান? সেই ছিরামপুর।"

"শ্রীরামপুর এখান থেকে কত দূর?"

"কোশ দুই পথ হবে।"

প্রভা বলিল—"চল তবে আমরা শ্রীরামপুর যাই। সে লোকটা ভাঙ্গা বাইসিক্ল নিয়ে এলেই হয়।"

রজনী বলিল—"তুমি কি এই রোদ্দুরে দু ক্রোশ চলে যেতে পার? তোমার ভারি কষ্ট হবে।"

প্রভা প্রফুল্ল মুখে উৎসাহের সহিত বলিল—"কিছু না। দু ক্রোশ ভারি ত; আমি খুব যেতে পারি।"

রজনী রাখালবালককে বলিল—"কোনও গ্রাম থেকে একখানা পাল্কী ডেকে আনতে পারিস্?"

রাখাল বলিল—অবশ্য পারে। কিন্তু গ্রাম দুর, যাইতে আসিতে দুই ঘণ্টা লাগিবে।

প্রভা বলিল—"না না,—পাল্কীর কোনও দরকার নেই। আমি বেশ চলে যেতে পারি। ওগো, তুমি আমায় যত সুকুমার মনে করছ আমি তা নই। আমি সেকালের রাজকন্যেদের মত ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইনে।"

ফুলের কথা শুনিয়াই রজনী তাহার কোটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভারও চক্ষু সেই দিকে পড়িল। প্রভা বলিয়া উঠিল—"আমার ফুল কি করলে? যুদ্ধে খুইয়ে এসেছ না কি বীর মশাই?"

রজনী দুঃখিত ভাবে বলিল—"ফুলটি গেছে দেখছি।"

প্রভা বলিল—"আচ্ছা, অত দুঃখ করতে হবে না।" বলিয়া

প্রভা ক্ষেতে নামিয়া গিয়া এক গুচ্ছ কড়াইসুঁটির ফুল তুলিয়া আনিল। রজনীর কোটে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল—"এ ফুলের যে ভারি প্রশংসা করছিলে—এই নাও তারই বটন্‌হোল্‌।"

এতক্ষণে রজনীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সেখানে রাখালবালক উপস্থিত ছিল, সুতরাং এবার আর 'ধন্যবাদ' দেওয়া হইল না। শুধু প্রভার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া সস্নেহে নিষ্পেষণ করিল।

এমন সময় দেখা গেল, হুগলির দিক হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে। উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আশা করিতে লাগিল,—গাড়ী খানি যদি খালি হয় ত বড় ভাল হয়।

গাড়ী খানি খালিই আসিতেছিল। শ্রীরামপুর হইতে কোন গ্রামের জমিদারের জামাতাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

রজনী গাড়ীকে আটক করিল। একটু পরে ভগ্ন বাইসিক্ল গাড়ীর ছাদে তুলিয়া, লোক দুইটাকে পুরস্কৃত করিয়া, প্রভা ও রজনী শ্রীরামপুর অভিমুখে চলিল।

গাড়ী ছাড়িল। রজনী বলিল—"প্রভা, আজ তোমার বড় কষ্ট হল। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? তোমার মুখখানি যেন শুকিয়ে গেছে।"

প্রভা হাসিয়া বলিল—"গুরুজনের কথা না শোন কাণে—!"

রজনী বলিল—"সে ত কদিন থেকেই শুনছি। আমার কথার উত্তর দাওনা। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? চল, শ্রীরামপুরে গিয়ে কিছু খাবে।"

প্রভা বলিল—"ক্ষিদে পেলে কি খেতে আছে? মা বলে দিয়েছেন গায়ে হলুদের আগে কিছু খেতে নেই।"

রজনী বলিল—"সে ব্রত ত একবার ভঙ্গ হয়ে গেছে।"

প্রভা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কখন গা?"

"কড়াইসুঁটির ক্ষেতে।"

প্রভা বলিল—"ওগো তাই ত! তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন?"

"আমার দোষ? তুমি আমাকেও খাইয়ে দিয়ে আমারও ব্রতভঙ্গ করেছ।"

"তোমার দোষ নয় ত কার দোষ তবে?"

রজনী বলিল—"বেশ! তোমার দোষও আমার দোষ বুঝি? তবু এখনও বিয়ে হয় নি।"

প্রভা কৃত্রিম রোষসহকারে বলিল—"আমার কখনও কোনও দোষ হতে পারে? সব দোষ তোমার।"

এই অন্যায় অপবাদ রজনীর একান্ত অসহ্য হইল। সে প্রভাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে—রাস্তার দুই পাশ জনশূন্য দেখিয়া—প্রভার মুখখানি নিজের বক্ষের নিকট টানিয়া লইল।

সম্পূর্ণ।